প্রমথ চৌধুরীর কথা সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক চেতনা

কাকলী সুলতানা

এম. ফিল. থিসিস

402423

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library

402423

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রমথ চৌধুরীর কথা সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক চেতনা।

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

গবেষক
কাকলী সুলতানা

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'প্রমথ চৌধুরীর কথা সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক চেতনা' শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম, ফিল, ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

কাকলী সুলতানা
এম, ফিল, গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, কাকলী সুলতানা কর্তৃক উপস্থাপিত 'প্রমথ চৌধুরীর কথা সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক চেতনা' শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেননি।

23.12.08

(ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথম থেকেই যাঁর ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতা আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে তাঁর অনুপ্রেরণা, আন্তরিক সহযোগিতা, সুদক্ষ-পরিচালনা ও নির্দেশনা আমার গবেষণা কর্মকে অগ্রগতি সাধনে সাহায্য করেছে। বিশাল হৃদয়ের অধিকারী, সদা হাস্যময় আমার তত্ত্বাবধায়ক এ গবেষণা কর্মটি তত্ত্বাবধায়ন করার কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

আমি আমর সহাপাঠী মোস্তফা এনামের উৎসাহে এম, ফিলে ভর্তি হয়েছি এবং যথেষ্ঠ উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছি। আমার ছোট বোন মাহবুবা সুলতানা শিল্পী ও আমার বন্ধু মহাদেব সরকার এর উৎসাহ উদ্দীপনা আমাকে আমার গবেষণা কর্ম সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছে। আমার বড় ভাই সাহিত্য ও সংস্কৃত অনুরাগী আশফাকউদ্দিন মামুন আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমি আমার পিতা-মাতার কাছে ঋণী কেননা তাঁরাও আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং দোয়া করেছেন যেন আমি কাজটি সফলতার সঙ্গে শেষ করতে পারি।

আমার কর্ম ক্ষেত্রে আমার প্রধান শিক্ষিকা মহান ব্যক্তিত্ব কর্ম অনুরাগী রাহিমা বেগম বিভিন্ন সময়ে আমাকে অনুপ্রেরণা ও কাজে সুবিধা দিয়ে আমাকে অপরিসীম ঋণে আবদ্ধ করেছেন। একই সাথে আমার অন্যান্য সহকর্মীরাও আমাকে যথেষ্ঠ উৎসাহ যুগিয়েছেন। বড় ভাই আরবী বিভাগের ডঃ জয়নাল আবেদীনের নিকট আমি কৃতজ্ঞ, আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য। আরও যারা আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন তারা হলেন- কাশীনাথ দাস, কামরুন নাহার, এমদাদুল কবির রবিন, সেলিনা আক্তার। সবশেষে বলব যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন কিন্তু নাম উল্লেখ করতে পারলাম না তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রমথ অধ্যায়	ঃ	প্রাসঙ্গিক কথা	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	প্রমথ চৌধুরীর গল্পে বিষয় স্বাতন্ত্র্য	৭
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	নীল-লোহিত ও ঘোষাল সম্পর্কিত গল্প	৩৬
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	প্রমথ চৌধুরীর গল্পের আঙ্গিক চেতনা	৪৮
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	প্রমথ চৌধুরীর গল্পে রূপ চেতনা	৬২
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	উপসংহার	৭৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রাসঙ্গিক কথা

প্রমথ চৌধুরীর শিল্পীসত্তার স্বরূপ, অভিজ্ঞতা, জীবনের প্রতি আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি, সচেতন প্রাজ্ঞ মন নিয়ে তিনি যে গল্প লিখেছেন তা অভিনব ও চমকপ্রদ। রবীন্দ্রনাথের সমকালে রাবীন্দ্রিক প্রভাব এড়িয়ে নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র ধারার উপস্থাপন করে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীর্ঘকাল অধ্যয়ন, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক জ্ঞান, কৃষ্ণনগরের প্রতিমা নির্মাণের কৌশল, সেখানকার মানুষের ব্যবহৃত ভাষা, পারিবারিক পরিবেশে বৈঠকী আবহের মধ্য দিয়ে প্রমথ চৌধুরী ক্রমাগত নিজেকে পরিশীলিত করেছেন এবং তাঁর সেই অভিজ্ঞতাকে বিন্যাস করেছেন তাঁর সাহিত্যে। ছোটগল্পে তিনি রবীন্দ্রনাথ সমকালে লালিত হয়েও সংস্থিত করেছেন নিজস্ব রীতি, যা অভিনব এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য, প্রকাশভঙ্গি, পরিচর্যারীতি, শব্দবিন্যাস সর্বক্ষেত্রে তিনি স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী।

অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনাঃ অভিসন্দর্ভে প্রমথ চৌধুরীর সমগ্র গল্পের তিনটি দিক সম্পর্কে আলোকপাত করে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম স্তরে গল্পের বিষয়, বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য, বিষয়ের গভীরে তাঁর চিন্তা-চেতনা, পছন্দ-অপছন্দ, বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি এই দিকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে গল্পের আঙ্গিক সম্পর্কিত দিক আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত। প্রমথ চৌধুরী গল্পের অভিনব আঙ্গিকের জন্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। সম্পূর্ণ নতুন ও স্বতন্ত্র এক আঙ্গিক তিনি গড়ে তুলেছেন। তাঁর এমন অনেক গল্প আছে যেখানে কোন কাহিনী নেই, কিন্তু ভাষার কারুকার্য, শব্দের গাঁথুনি এবং বাক্য ব্যবহারের চমৎকার নৈপুণ্য পাঠককে নির্মল আনন্দ দিয়েছে। মার্জিত পরিশীলিত ভাষা ব্যবহার করে তাঁর প্রতিটি গল্পের গঠনশৈলীতে বাকচাতুর্যের অপূর্ব সমন্বয়ে হৃদয়াগ্রাহী করে তুলেছেন। তৃতীয় স্তর হচ্ছে রূপ ভাবনা। তিনি নিজে যেমন ছিলেন সুন্দর,সুপুরুষ,তেমনি লেখার ক্ষেত্রেও সৌন্দর্যকে প্রধান অবলম্বন করে রূপের বর্ণনা দিয়েছেন নিখুঁত ভঙ্গীতে। গল্প সংগ্রহ গ্রন্থের মোট ছেচল্লিশটি গল্পের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে লেখকের চিন্তাধারার আলোকে ধারাবাহিকভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনটি স্তরে বিষয়, আঙ্গিক, রূপভাবনা এভাবে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম স্তরঃ প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য ও চরিত্র বিশ্লেষণ এ পর্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়। তাঁর গল্পের বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলে বিস্মিত হতে হয়, এত বৈচিত্র্যও মানুষের জীবনে আছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কল্পনার নানা রঙে, ভাবলু তাকে, গতানুগতিকতাকে পরিহার করে সম্পূর্ণ নতুনের, যৌবনের ধ্বনিকে হৃদয়ে ধারণ করে ক্ষুদ্র বিষয় এমন কি ভূত-পেত্নী নিয়েও গল্প রচনা করেছেন। কিন্তু ভূত-পেত্নী হোক আর কোন লেঠেল কিংবা কোন আসরের গল্পবলিয়েই হোক এঁরা সকলে অসাধারণ, কোন না কোন কারণে অসামান্য। প্রমথ চৌধুরীর অনবদ্য সৃষ্টি নীল-লোহিত, যাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়কটি গল্প গড়ে উঠেছে। এরপর আছে ঘোষাল যিনি কথার যাদুতে আসর জমিয়ে রেখেছেন। সারদাদাদাও গল্প বলায় দারুণ ওস্তাদ। আছে ভূতের গল্প, জমিদার-চরিত্র, আসামী, নেশাখোর, বাইজী, কেরানী, ইংরেজ, প্রেমিক সব রকম চরিত্র নিয়ে তিনি বিস্তৃত গল্প রচনা করে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী, অন্তর্ভেদী ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বাবরি চুলের লাঠিয়ালদের লাঠি খেলার নৈপুণ্য, পাগল চরিত্রকে চমৎকার ভঙ্গিমায় উপস্থাপন, নেশাখোরের নিখুঁত অভিনয়, বড়লোকের খেয়ালের বর্ণনা সবক্ষেত্রে এমন অনায়াস বর্ণনা, কাহিনী ডানা মেলেছে, কল্পনার ভেলায় ভেসে পাঠককে নির্মল আনন্দ দিতে পেরেছেন। আর এসব চমৎকার কাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েছে সৌন্দর্যচেতনা ও প্রকৃতির অভিনব বর্ণনা।

গল্পের বিষয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে উঠে এসেছে গল্পগুলির কাহিনী, কাহিনীর গভীরে প্রমথ চৌধুরীর চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। কাহিনীতে বর্ণিত চরিত্রগুলির অন্তরালে তাঁর চিন্তাধারা মানসিক বৈশিষ্ট্য সহজেই প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার বিষয় নিয়ে তিনি গল্প রচনা করলেও একটি বিষয়ে গভীর মিল পরিলক্ষিত হয়েছে, তাহল প্রতিটি গল্পে তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপ্রিয়তা, কৌতুক-প্রবণতা ও হাস্য-পরিহাসপ্রিয়তা। তাঁর গল্পে বর্ণিত চরিত্রগুলিকে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্কন করে হাস্যরস সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের কিছু মানুষের অন্তঃসারশূন্যতাকে উপস্থাপন করেছেন। গল্পের বিষয়ের গভীরে চরিত্রগুলির মানসিক জড়তা, সংকট ও মুক্তি নিয়ে আলোচনা করলেও

Dhaka University Institutional Repository

তাদের বাস্তব জীবন অতটা প্রাধান্য পায়নি । অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বাস্তব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে করতে সহসা মানসিক জগতে ফিরে গেছেন এবং মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সে সমস্যাকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কল্পনার উপর ভর করে, মিথ্যা কথার ফুলঝুরিতে তাঁর অনেক গল্পের কাহিনী এগিয়ে গেছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম স্তরে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বিষয় আলোচনার মাধ্যমে তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বিষয় অতিক্রম করে, যে দিক তাঁকে ব্যতিক্রম অভিধায় অভিষিক্ত করেছে সেই আঙ্গিক চেতনার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' নামক পত্রিকার প্রকাশ ঘটিয়ে যৌবনের পূজারী হিসেবে নতুন আঙ্গিক ও নতুন ভাষা বিন্যাসের রীতি প্রয়োগ করেছিলেন। আঙ্গিক চেতনায় ভাষা বৈচিত্র্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যুক্তি বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার আলোকে গভীর চিন্তাশক্তির অধিকারী লেখক চলিত রীতি ব্যবহার করে তার প্রাধান্য অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি গভীর পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করেই সাহিত্যচর্চায় অগ্রসর হয়ে নতুন ভাষারীতি, স্টাইল ও অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। শব্দ, কথায় বর্ণে ছন্দে তাঁর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত সাহিত্য ভাষার কারুকাজে খচিত এক শিল্পিত বিন্যাস।

প্রমথ চৌধুরীর চিন্তাধারা, লেখনীর প্রায়োগিক চর্চা, সর্বোপরি বুদ্ধিবৃত্তি সব কিছুই স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তাঁর দৃষ্টি ছিল সব সময়ই বিবর্তন ও পরিবর্তনের পক্ষে। তিনি ফরাসি সাহিত্য পাঠ করে বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে যে রুচি আর মেজাজের পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁকে সমকালীন অন্য সাহিত্যিক থেকে পৃথক করেছে সহজেই। তিনি গভীর মনোনিবেশের সাথে ফরাসি ও সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করে এসব সাহিত্যের ক্ষিপ্রতা ও সৌন্দর্যপ্রীতিকে তাঁর গল্পের অন্যতম বাহন করেন। চিন্তায় স্বাতন্ত্র্য, চলিত ভাষা মিশ্রিত তির্যক রূপভঙ্গি, বিচিত্র বিষয়ের সংযোজন দ্বারা সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী মানসে এক নতুন চিন্তার বীজ বপন করে গেছেন। তাঁর গল্পে তর্কের মাধ্যমে শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম, ইতিহাস সব বিষয়ের অনুপুঙ্খ আলোচনা অন্তর্ভূক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রমথ চৌধুরী কোন উপন্যাস লেখেননি । বৃহদাকৃতি রচনার প্রতি তাঁর কোন আর্কষণ ছিল না। তাঁর গল্পের ভাষার মধ্যে রয়েছে তীক্ষ্ণ মননশীলতা, বাকচাতুর্যের চমৎকারিত্ব এবং বুদ্ধির অসিচালনা। কিন্তু তাঁর জগৎ ও জীবনদৃষ্টি বুদ্ধিকে একমাত্র অবলম্বন করে তোলায় মানুষকে সম্পূর্ণ দেখবার চেষ্টা করেনি। আবেগ যে মানবচিত্তের একটা প্রধান অংশ, দুঃখের তীব্রতা, রোমন্টিকতা, সৌন্দর্যধ্যান সবই যেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর কটাক্ষ করে উড়িয়ে দেবার বস্তু, এসব বস্তু ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে গতানুগতিক করে গড়ে তোলেননি বরং তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, হাস্য-পরিহাসে, তর্ক-বিতর্কের দ্বারা চমৎকার এক আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। শব্দ সচেতনতা সুক্ষ্ম সৌন্দর্যজ্ঞান ও পরিমিতিবোধ তাঁর রচনার প্রধান গুণ। মননশীলতা, যুক্তিপ্রিয়তা, সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার দ্বারা প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রতিটি গল্পকে শিল্পসুলভ চরিত্রের অন্তরঙ্গ স্পর্শে প্রাণময় করে তুলেছেন।

গল্পে কাহিনী ও চরিত্রের সমন্বয়ে একটা জীবনবোধ প্রকাশিত হয়। কবিতার সাথে এর পার্থক্য অনিবার্য। কবিতায় যে ভাব, উচ্ছ্বাসকে বাধাহীনভাবে প্রকাশ করা হয়, এখানে তা লক্ষ্য করা যায় না। প্রমথ চৌধুরী সে রীতিকে অনুসরণ করতে গিয়েই হয়তো তাঁর গল্পে কোন আবেগ উচ্ছ্বাসকে প্রাধান্য দেননি। তাঁর গল্পে কল্পনা আছে, কিন্তু তা বাস্তব বুদ্ধির অতীত। তিনি বলেছেন যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দেয়া, সমাজ সংসারে নিত্য যা ঘটে তাকে প্রাধান্য না দিয়ে কল্পনার রঙে বিচিত্র কাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়ে চমৎকার আঙ্গিক গড়ে তোলাই শিল্পীর দায়িত্ব। তাঁর গল্পে বর্ণিত কল্পনাকে আবেগে আপ্লুত না করে, রঙ দিয়ে অতিরঞ্জিত না করে, চমৎকার ধ্বনিমাধুর্য, কথার যাদুকরী ছন্দ আর বুদ্ধি অভিজ্ঞতা আর সৌন্দর্যচেতনা দিয়ে সমগ্র গল্পের অবয়ব জুড়ে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। পরিণত একটা অবয়ব গড়ে তুলে গভীর চিন্তা ও ভাবাবেগ দ্বারা শব্দ সমৃদ্ধির মাধ্যমে তিনি এক সমৃদ্ধ সাহিত্য উপহার দিয়েছেন যার ছিল প্রসন্ন দীপ্তি। তিনি গল্পের ভাষায় এমন একটা তীর্যক ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন যা তাঁকে সহজেই স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম । তিনি যুক্তি, বুদ্ধি আর্টের সমন্বয়ে নতুন চিন্তা-চেতনা ও ভাষারীতি দ্বারা বাংলা সাহিত্যেকে সমৃদ্ধ করেছেন। গল্পে বর্ণিত চরিত্র, প্রকৃতির এত নিখুঁত আর প্রাণবন্ত বর্ণনা এবং যে বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করছেন ষা তাঁর গল্পের গঠনশৈলীকে এক স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে একটি উদাহরণ দিলে তাঁর ছোটগল্পে চরিত্রের সৌন্দর্য বর্ণনায় তাঁর চমৎকার বর্ণনাভঙ্গি ও উপমা ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যাবে। "চমৎকার দেখতে একেবারে নীল পাথরের ভেনাস।"[১] গল্পের গঠনশৈলীতে এমন অভিনব বর্ণনা সংযোজন করে তিনি একজন দক্ষ শিল্পীর মত তুলির আঁচড়ে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। গল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে আলোচনায় এমন অনেক উদাহরণ দেখা যাবে।

তৃতীয় পর্যায়ে দেখান হয়েছে সৌন্দর্যপিপাসু প্রমথ চৌধুরীর বিভিন্ন গল্পে বর্ণিত তাঁর অতি উঁচু অভিজাত রুচিশীল সৌন্দর্যপ্রীতির বিভিন্ন দিক । প্রমথ চৌধুরী যশোহরে জন্ম গ্রহণ করলেও বেড়ে উঠেছেন কৃষ্ণনগরে । তখনকার কৃষ্ণনাগরিকেরা যেমন ছিলেন হাস্যরসিক, একই সাথে যর্থাথ আর্টিস্ট। কৃষ্ণনাগরিকদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় মূর্তি গড়ার যে দক্ষতা প্রমথ চৌধুরী দেখেছিলেন তাই তাঁকে পরবর্তীকালে নারীরূপের সৌন্দর্য রূপ নির্মাণে সহায়তা করেছিল। যে কোন প্রকার সৌন্দর্য তাকে আকৃষ্ট করত, সৌন্দর্যপিপাসু এই নিপুণ শিল্পী সৌন্দর্যের সঙ্গে সম্মিলন ঘটিয়েছেন বুদ্ধিমত্তার যা তাঁকে এক বিশিষ্ট শিল্পীর মর্যাদার অভিষিক্ত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১। প্রমথ চৌধুরী, গল্প সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১ম সংস্করণ, ১৩৪৮, কলিকাতা, ১৩৯৪, পৃঃ ৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বিষয় স্বাতন্ত্র্য

এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা নিয়ে প্রমথ চৌধুরী মধ্যবিত্তের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা আর বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে ছোটগল্পের এক সমৃদ্ধ ভান্ডার গড়ে তুলেছেন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমাজের অলি-গলিতে বিচরণ করেছেন, তাঁর দৃষ্টির প্রসারতা সবকিছু এত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য পাঠককে চমকিত করেছে। তিনি ছিলেন মননশীল, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীল, নতুনের পূজারী এক বিদগ্ধ লেখক। ভাবালুতা, ভাবাবেগক তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি। যার ফলে দেখা যায় প্রমথ চৌধুরীর গল্পে মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। তিনি নাগরিক সাহিত্যিক, বিংশ শতাব্দীর বাংলার নাগরিকতার ভাষ্যকার প্রমথ চৌধুরী দর্শনের ছাত্র, দর্শন তাঁর প্রিয় বিষয়। তাই মানুষের মানসিক জড়তা, সংকট ও মুক্তি নিয়ে যতটা আলোচনা করেছেন, তাদের বাস্তব জীবন নিয়ে ততটা করেননি। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বাস্তব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সহসা তিনি মানসিক জগতে পরিক্রমণ করতে শুরু করেন এবং মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সমস্ত বাস্তব সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে আসেন।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর ক্ষুরধার মেধা, অন্তর্ভেদী বুদ্ধি, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে সঙ্কীর্ণ সমাজের সর্বত্র প্রদক্ষিণ করেছেন, এর আনাচে-কানাচে, অলিতে-গলিতে, আড়ালে-আবডালে, উপরে-নীচে, ভেতরে-বাইরে ঘুরেছেন দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। কখনও কখনও মধ্যবিত্ত জীবনের সূত্র ধরে বিচরণ করেছেন অভিজাত সমাজে। কখনও মজলিশী ঢঙে, কখনও কয়কজন সমবয়সী বন্ধুদের মধ্যে তর্ক-বির্তকের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এক একটি গল্পের পটভূমি।

ছোটো গল্পঃ 'ছোটো গল্প' নামক গল্পে কয়েকজন বন্ধুর তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে গল্পের কাহিনী এগিয়ে গেছে। ছোট গল্পের প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করেছেন বিভিন্নজন মিলে। এক্ষেত্রে প্রফেসরের মতে- ছোটগল্পের মাপ হচ্ছে এক ফর্মা, যার দেহ এক ফর্মার আটে না তা বড় গল্প না হতে পারে কিন্তু ছোটগল্প নয়, বীরবল ছোটগল্পের এ ধারণায়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোর আপত্তি। প্রশান্তও কেবল ছোট বড়র তফাৎকে গল্পের উপাদান বলা ঠিক মনে করেন না। তাঁর মতে ছোটগল্প হওয়া উচিত একটা ফুলের মত। বর্ণনা ও বক্তৃতার লতা পাতার তার ভিতর স্থান নেই। আর ছোটগল্পের প্রাণ হচ্ছে ট্র্যাজিক রূপ। আর অনুকূলের মতে কমিক যেহেতু জীবনের মূল সেহেতু শুধু ট্র্যাডিজীকে ছোটগল্পের মূল বলা যাবে না। তাঁর মতে ট্র্যাজেডী কমেডীই ছোটগল্পের প্রাণ। প্রফেসর এসব কথা শুনে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তাহল তিনি গল্প ছাপলে তা আট পেজের কম হবে না, ষোল পেজেরও বেশী হবে না বার পেজের কাছ ঘেঁষেই থাকবে।

এসব তর্ক-বিতর্কের পর প্রফেসর যে গল্প বলেছিলেন তাহল একবার তিনি রানাঘাট থেকে যাবার সময় ঘটনাক্রমে ট্রেনের কামরায় তাঁর পরিচয় ঘটে মিঃ দে- এর সাথে। দে সাহেবের দুই কন্যার মধ্যে একজন ছিল অপূর্ব সুন্দরী অপরটি বাবার মত। প্রফেসর এই সুন্দরী কন্যাটিকে বড় কন্যা ভেবে আর তার চোখের ভাষায় মনের কথা বুঝে নিয়ে তাঁর বাবাকে বহু বলে কয়ে রাজি করালেন প্রস্তাব পাঠাতে। পাত্রপক্ষ কন্যা দেখতে আসলে যাকে আনা হল সেই মেয়ে দে সাহেবের মত দেখতে সাজগোজের মধ্য দিয়েও যার কদর্যতা ফুটে বেরিয়েছিল। পরে জানা গেল ঐ সুন্দরী রমণী দে সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, নাম কিশোরী। সব জানার পর সবার অনুরোধ সত্ত্বেও প্রফেসর বিয়েতে আর রাজি হলেন না। এরপর যে ঘটনা ঘটে তা আরও বিয়োগান্তক। দে সাহেবের মৃত্যুর পর কিশোরী ও তার কন্যা পিতা মাতার দায়িত্ব প্রফেসরের উপর পড়ায় স্বল্প আয়ে একটি পরিবার চালাতে গিয়ে তাঁর বিয়ে করা সম্ভব হয়নি। আর প্রফেসর যে গল্প বলেছেন তা ষোল পেজে শেষ হয়নি, আর হয়নি অবশ্য সকলের জেরার কারণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরীর গল্পের আকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। ছোটগল্প সম্পর্কে তাঁর অভিমত-"গল্পটি কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ আমার জীবনবৃত্তান্ত থেকে চুরি করেচ- ঠিক গল্পটি নয় কিন্তু তার বৃত্তান্তটি। কিন্তু খুব উপাদেয় হয়েচে। এ'কে মারাত্মক গল্প বলা যেতে পারে কারণ, বুদ্ধকে মার যে-রকম প্রলুব্ধ করেছিল, তোমার গল্পের উপসংহারে সেই রকম একটি মারের প্রলোভন উদ্যত আছে- সুকুমারমতি পাঠকেরা নিশ্চয় নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌বে আহা ঐ বিধবার সঙ্গে বিবাহ হলেই ত চুকে যায়- কিন্তু তাহলে গল্পের তপস্যা ঐখানেই মাটি।"[১]

Dhaka University Institutional Repository

প্রমথ চৌধুরী গল্প লিখতে গিয়ে যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখতেন তার স্পষ্ট প্রমাণ আলোচ্য 'ছোটো গল্প' নামক গল্পটি। সমাজের প্রথা অনুযায়ী অন্য সাহিত্যিকদের মত গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করেননি বলেই তিনি সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেননি। এই গল্পে দেখা যায় কয়েকজন বন্ধু মিলে আসরে বসে গল্প ও তর্ক করার প্রবণতা। প্রমথ চৌধুরীর স্বভাবসিদ্ধ প্রাবন্ধিক রীতিতে এ গল্পের কাঠামো গড়ে উঠলেও এতে একটি কাহিনী রয়েছে। তর্ক হচ্ছে এ গল্পের প্রাণ। যে কারণে তর্কে-বিতর্কে আর অপ্রাসঙ্গিক কথার আড়ালে গল্পের মূল সুর থেকে সরে এসে লেখক তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে গল্পের ট্র্যাজিক বিষয়টিকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তোলেননি। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের একটি অন্যতম বিষয় সৌন্দর্যচেতনা- যা এ গল্পে কিশোরীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। সৌন্দর্যের বর্ণনা থাকলেও তিনি সচেতনভাবে গল্পে প্রেমের মোহজাল বিস্তার করেননি, অশ্লীলতাকে প্রাধান্য দেননি। প্রফেসর ও কিশোরীকে নিয়ে একটি করুণ মধুর প্রেম গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে নসাৎ করে দিয়ে তিনি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রচনাশৈলী দ্বারা ত্যাগের মহিমাকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

চার-ইয়ারি কথাঃ মননশীল লেখক প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির মধ্যে 'চার ইয়ারি কথা' একটি অন্যতম গল্প। চার বন্ধুর জীবনে ঘটে যাওয়া প্রেমের চমকপ্রদ কাহিনী এই গল্পগুলির মূল আর্কষণ। সেদিন ঝড় বাদলের রাতে আটকা পড়ে মদের আসরে বসে আড্ডা দিতে গিয়ে চার বন্ধুর মনের দরজা খুলে গিয়েছিল। প্রেম সম্পর্কে মানুষের যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি তা যেন এখানে কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হয়েছে, প্রেমের চিরন্তন রূপ অন্বেষণ না করে তাকে হাস্যরসে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে স্বতন্ত্রধারার পরিচয় দিয়েছেন। এ কারণেই হয়তো বহু সমালোচক প্রমথ চৌধুরীকে হৃদয়রস বর্জিত লেখক বলে অভিহিত করেছেন। যদিও প্রতিটি কাহিনীর শুরুতে হৃদয়াবেগের কোন কমতি ছিল না । আর এই হৃদয়াবেগ শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি বলেই হয়তো সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের মত জনপ্রিয় হতে পারেননি। রোমান্টিক ভাব নিয়ে গল্পের কাহিনী শুরু হলেও শেষে হাস্যরসে পরিণত হয়েছে যখন জানা গেছে চার বন্ধুর প্রেমিকাদের মধ্যে কেউ চোর, কেউ পাগল অথবা কেউ প্রবঞ্চক কিংবা কেউ পরলোকবাসী।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম গল্প চার বন্ধুর এক বন্ধু সেনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এক পূর্ণিমা রাতে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে একটি পূর্ণযৌবনা অপূর্ব সুন্দরী ইংরেজ রমণীর সাথে সেনের সাক্ষাৎ হয়। সেদিন কলকাতায় জ্যোৎস্না ফুটেছিল, আকাশে যেন আলোর বাণ ডেকেছিল।আর এই আলোর মায়ায় সেন মূহুর্তেই ঐ অপূর্ব সুন্দরীর প্রেমে পড়লেন। সেই মূর্তিময়ী পূর্ণিমা সেনের দিকে অপূর্ব দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল। আর সে চাহনীতে তাঁর হৃদয় একেবারে গলে গিয়েছিল। তিনি যখন সেই অপূর্ব সুন্দরীর হাতের স্পর্শ পেলেন তখন তাঁর হৃদয়ের মধ্য দিয়ে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। এর মধ্যে হঠাৎ সেই রমণী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত দক্ষিণ দিকে দৌড়াতে লাগল মিনিট কয়েকের মধ্যে প্রকাশ পেল মেয়েটি একেবারে উন্মাদ পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে এসেছে। আর রক্ষকেরা তাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। সেই উন্মাদিনীর অট্টহাসি ও কান্না সেনের সমস্ত ভালোবাসা ও স্বপ্নকে মুহুর্তে ধূলিসাৎ করে দিল। সেনের কথা-"আমি সেইদিন থেকে চিরদিনের জন্য eternal feminine কে হারিয়েছি, কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।" [২]

এরপর সীতেশের কাহিনী। পুরানো বই ঘাঁটতে গিয়ে সীতেশের এক স্ত্রীলোকের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তৈরী হয়ে গেল। দুজনে মিলে বিভিন্ন রকম বই দেখতে লাগলেন এবং সীতেশ একটি ফরাসি বই তুলে দাম দিতে গিয়ে পকেট হাতড়ে যখন দেখলেন তাঁর কাছে কেবল পাঁচটি গিনি আছে কোন শিলিং নেই তখন মেয়েটি যেচে বইটির দাম দিয়ে দিল। এরপর মেয়েটিকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য তার সঙ্গী হলেন। সীতেশ তখন মেয়েটির ভালোবাসায় একবারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তাঁর ভাষায়-"আমি তখন নিশিতে- পাওয়া লোকের মত জ্ঞানহারা হয়ে চলছিলুম।"[৩] স্ত্রীলোকটি তাঁকে বিদ্রূপ করা সত্ত্বেও তাকে প্রেম নিবেদন করলেন, নিজের ঠিকানা দিলেন এবং তার ঠিকানা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। মেয়েটি ভালোবাসায় আচ্ছন্ন হয়ে গিনিসহ পকেট কেস অবলীলায় মেয়েটির হাতে তুলে দিলেন। মেয়েটি তাঁকে প্রতিজ্ঞা করায় মেয়েটি চলে যাওয়ায় দশ মিনিট পরে যেন তিনি চোখ খুলেন। মেয়েটির প্রেমে মোহগ্রস্ত সীতেশ আন্দাজও করতে পারেনি মেয়েটি তাঁকে ঠকিয়ে তাঁর সবগুলি গিনি নিয়ে পালিয়েছে। মেয়েটি একটি চোর। সীতেশ যখন দেখতে পেলেন তাঁর একটি গিনিও নেই তখন তাঁর রাগ হয়নি, মেয়েটির জন্য কষ্ট হয়েছে, কেন তাঁর কষ্ট তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি। সীতেশের

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমে পড়া, ঘটনা এগিয়ে যাওয়া, শেষমেষ প্রেমিকার চুরি করে পলায়ন প্রেমের সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ন করে, প্রেম সম্পর্কিত রোমান্টিক ধারণাকে ম্লান করে দেয়।

এ গল্পের তৃতীয় ঘটনা সোমনাথকে ঘিরে। অনিদ্রা রোগে ভুগে সোমনাথ ইংল্যান্ডের সমুদ্রের ধারে একটি ছোট শহরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে এক স্নেহময়ী সুন্দরী যুবতীর সাথে তাঁর আলাপ হয়। তাকে সোমনাথ সেভিয়ার তারিণী ওরফে রিণী বলে ডাকতেন। অন্য বন্ধুদের মত তিনি মোহগ্রস্ত আর আবেগপ্রবণ না হলেও রিণীকে তিনি ভালোবেসে ফেললেন এবং এক বছর ধরে তাদের প্রেম চলল। কিন্তু এ প্রেম ছিল ফাঁকি আর ছলনায় ভরা। সোমনাথ এক সময় জানতে পারলেন রিণী তাঁর সাথে প্রেমের খেলা খেলেছে কেবল জর্জকে ক্ষেপানোর জন্য। জর্জকে ক্ষেপিয়ে তার মধ্যে ঈর্ষার আগুন দ্বিগুণ করে তাকে পাওয়ার জন্য সে সোমনাথের সাথে মিথ্যে প্রেমের অভিনয় করেছে। জর্জের মধ্যে ঈর্ষা জাগিয়ে এই মোহিনী রমণী নিজের স্বার্থ উদ্ধার করেছে।

ভূদেব চৌধুরীর ভাষায়- "সীতেশের গল্পের চেয়ে সোমনাথের গল্প আরো জমাট। এও এক প্রণয়বঞ্চিত পুরুষের আত্মকথা; কিন্তু বঞ্চনার পরিমাণ এবারে আগের গল্পের মতো অত হালকা বা হাস্যকর নয়। বিশেষ করে সোমনাথের চরিত্রের সিরিয়াসনেস তার প্রণয়-বঞ্চনার মধ্যে সার্থক ট্রাজেডীর সুর অনুস্যূত করে দিতে পারত। কিন্তু চৌধুরীমশায় তাঁর স্বভাবনিপুণ কৌতুকপ্রিয়তা দিয়ে গল্পের পরিণামবিন্দুতে এক অনতিচ্ছেদ্য স্মিত সুহাস ছড়িয়ে দিয়েছেন। চলতি কথা আছে 'তেল পোড়ে, সলতে হাসে, প্রমথ চৌধুরীর গল্পের সহাস প্রসন্নতা তেমনি; তাঁর হাসি পরিহাস-তীব্রব্যঙ্গ-রূঢ় নয়, পাঠকের চিত্তভূমি যখন নির্ভার কৌতুকে স্নিগ্ধ প্রসন্ন হয়ে ওঠে, গল্পের দেহে তখনো seriousness এর আবরণ ঘোচে না; শিল্পীর মন যখন পাঠককে কৌতুকে হাসায়, গল্প তখনো হাসে না- রচনাশৈলীর আশ্চর্য paradox এখানেই"। [৪]

রায়কে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে চতুর্থ কাহিনী। রায় লন্ডনে অবস্থানকালীন সময়ে আনি নামে এক দাসী তাঁকে ভালোবাসত। একথা সেই দাসী বহুকাল পর টেলিফোনের মাধ্যমে মধ্যরাতে

Dhaka University Institutional Repository

রায়কে জানায়। দাসী ছিল সুন্দরী এবং একই সাথে বুদ্ধিমতী কেননা রায়ের প্রতি তার তীব্র ভালোবাসা সে কখনও রায়ের কাছে প্রকাশ করেনি। তিনি চলে আসার পর আনির জীবনে কি কি ঘটনা ঘটেছিল, এরপর এক ডাক্তারের কৃপায় কিভাবে নার্স-হয় সবই সে রাতে আনি রায়ের কাছে বর্ণনা করেছিল। আর এসব কথা শুনে রায় ফোন রেখে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এ কাহিনীর শুরুতে এই ভেবে আশ্বস্ত হওয়া যায় যাক রায়কে অনন্ত কোন পাগল, চোর কিংবা প্রবঞ্চকের হাতে পড়ে নাজেহাল হতে হয়নি। দাসী হলেও সে সুন্দরী শিক্ষা-দীক্ষা আচরণে উন্নত রুচিবোধের অধিকারী । আর মন প্রাণ উজার করেই সে রায়কে ভলোবেসেছিল। কিন্তু কাহিনী শেষ করার মুহূর্তে যখন জানা যায় আনি এখন পরলোকে আর সেখান থেকেই সে রায়কে স্মরণ করেছে তখন পাঠকের আর বুঝতে বাকি থাকে না প্রমথ চৌধুরীর প্রেমভাবনা একই রকম।

এভাবেই চারটি কাহিনীর মাধ্যমে চার বন্ধুর জীবনে ঘটে যাওয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার শিল্পিত রূপ বর্ণিত হয়েছে 'চার-ইয়ারি কথা' নামক গল্পে। এখানে প্রেমকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে, রোমান্টিকতাও ছিল পুরোমাত্রায়- কিন্তু গল্পের শেষ দিকে প্রেম রোমান্টিকতা সম্পর্কে যে গতানুগতিক ধারণা তা প্রথম চৌধুরী পাল্টে দিয়েছেন। প্রথম অবস্থায় রোমান্টিকতা সহজ পথে আগালেও কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পর দেখা যায় গল্পের নায়িকা পাগল নয়তো চোর কিংবা প্রবঞ্চক অথবা পরলোকবাসিনী। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে "চার বন্ধুর প্রেমের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমাদের সমস্ত অভ্যস্ত সংস্কারকে বিচলিত ও প্রেম-সম্পর্কিত রোমান্টিক ধারণাকে বিপর্যস্ত করে। এই গল্পগুলি সাধারণ প্রেমের গল্প নয়। মনে হয়, চৌধুরী মহাশয় আমাদের প্রেম-সম্পর্কিত রোমান্টিক ধারণাকে ভেঙে দেবার জন্য এই গল্পগুলি রচনা করেছেন। অথচ গল্পগুলির আকষর্ণ সে-কারণে ক্ষুণ্ন হয়নি। বিশুদ্ধ গল্পরস ও বিচিত্র স্বাদের জন্য এবং অনুপম বর্ণনায় এগুলো উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, একথাও অনস্বীকার্য। তবে এ গল্পগুলির সম্পদ কোথায়? তা অন্যত্র। নীতিশাসনমুক্ত দায়িত্ব- বর্জিত বেপরোয়া যৌবনের প্রাণচাঞ্চল্যের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে এগুলিতে। আর সেইজন্যই এই চার বন্ধুকে আমরা উপহাস করি না, সমব্যাথী হই। এ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন চার ইয়ারি কথায় যেটুকু শাঁস সেটুকু একটি রক্তিম হৃদয়ের পদ্মরাগমনি, যেমন উজ্জ্বল, তেমনি করুণ। ইচ্ছা করলেই আর একখানা চার ইয়ারি লেখা যায় না, কেননা ইচ্ছে করলেই আর

Dhaka University Institutional Repository

একবার তরুণ হওয়া যায় না, আর একবার ফুল (fool) হওয়া যায় না। দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করে প্রথম যৌবনের সোয়ান-সং (Swan-Song) গাওয়া হয়েছে ওতে।" [৫]

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের প্রধান লক্ষণগুলি এখানে ফুটে উঠেছে। চারজনের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষপটে ঘটে যাওয়া প্রেমকাহিনী এখানে চারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের জন্ম দিয়েছে। বড়মাপের কাহিনী হলেও যেহেতু চারটি গল্পের সমন্বয় হয়েছে তাই একে অতি সহজেই ছোটগল্পের পর্যায়ে ফেলা যায়। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে-"এক হিসেবে চারটি গল্পই স্বয়ংসম্পূর্ণ আপাতদৃষ্টে মনে হয় চারটি পৃথক গল্পকে লেখক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অথবা চিরন্তন নারীর সন্ধানের সূত্রে এক সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন এবং গল্পগুলি পর্যায়ক্রমে পাঠক নিজের খুশিমত পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। কিন্তু চারটি গল্পের লেখক কর্তৃক নির্দিষ্ট পরমপরা অভিনিবেশ সহকারে অনুসরণ করলেই বোঝা যায় যে আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি গল্প অব্যর্থ বিশ্বস্ততার সঙ্গে ছোটগল্পের সমস্ত লক্ষণকে স্বীকার করে নিয়েও সেই স্বীকৃতিকে অতিক্রম করে গেছে, কেননা শেষ পর্যন্ত চারটি ছোটগল্প মিলে হয়ে উঠেছে এক বড় মানের গল্প মাত্র নয়, একটি সার্থক ছোট গল্প।" [৬]

চারটি কাহিনী নিয়ে গল্প গড়ে উঠলেও এর মূল সুর একই, আর তাহল প্রেম, প্রেম কোথাও প্রতিষ্ঠা পায়নি। অর্থাৎ প্রথম গল্পে সেনের মোহগ্রস্ত মনে সুন্দরী রমণীর প্রতি জ্যোৎস্না রাতে প্রেমের যে শিখা জ্বলে উঠেছিল তা প্রচন্ডভাবে নাড়া খায় যখন সে একটু পরে জানতে পারে মেয়েটি উন্মাদিনী। দ্বিতীয় গল্পে প্রেমের উন্মাদনা ছিল প্রচন্ড। সীতেশ নাম না জানা সুন্দরী মেয়েটির ব্যবহারে কথায় মুগ্ধ মোহাচ্ছন্ন হয় যে খুব সহজেই তাঁর পকেট-কেস মেয়েটির হাতে তুলে দেন এবং পরক্ষণেই জানতে পারেন মেয়েটি চোর এবং তাঁর পাঁচটি গিনি নিয়ে পালিয়েছে। সেই তুলনায় সোমনাথ ছিলেন কিছুটা সংযমী। তারপরও রিণীর ছলনায় পড়ে, ভালোবাসার মোহজালে ভুলে নিজেকে রিণীর কাছে ধরা দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানতে পেরেছেন রিণী একজন প্রতারক। আর রায়ের প্রেমতো ইহলোকের কোন নারীর সঙ্গেই হয়নি। গভীর রাতে যে নারী তাঁর সাথে কথা বলেছে সে পরলোকবাসিনী। এভাবে চারটি নিখুঁত, পরিপাট্য, অপূর্ব ও স্বতন্ত্র ঘটনার

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে চার-ইয়ারি কথা- যা কিনা কেবল প্রমথ চৌধুরীর মত জ্ঞানী বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষেই নির্মাণ করা সম্ভব।

প্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারি কথা' নামক গল্পের চারটি গল্পই সৌন্দর্যচেতনা ও যৌবনের আবেগে গড়ে উঠেছে এবং শেষও হয়েছে যৌবনের আবেগে । এই গল্পের মূল সুর প্রেম। প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'চার-ইয়ারি কথা' নামক গল্পটি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য যথাযথ-"ঠিক যেন তোমার সনেটেরই মত- পালিশ করা, ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ।"[৭] সত্যিকার অর্থে ভাষার সংযম, গঠননির্মাণ, শব্দচয়ন, চিন্তার স্বাচ্ছন্দ্য, সবদিক থেকে গল্পটি অপূর্ব এক দীপ্তি ছড়িয়ে পাঠককে চমকিত করেছে। প্রেমকে সংযমের আবরণ দ্বারা অপ্রত্যাশিত চমকের সমন্বয়ে, পরিপাটি গল্পরসের মাধ্যমে রূপায়িত করে স্বার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, মননশীল চিন্তা, তর্ক-প্রবণতা, হাস্যরস, সৌন্দর্যচেতনা এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রেমের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, এই গল্পগুলির প্রধান বিষয় হলেও প্রেম সম্পর্কিত রোমান্টিক ধারণা এখানে বিপর্যস্ত হয়েছে। প্রেম সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে তিনি অনুসরণ করে কাহিনীকে দুঃখ বেদনা দ্বারা আবৃত করে আবেগে অশ্রুবাস্পাকুল করে তোলেননি। প্রেমের রোমান্টিক ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়ে লেখক তাঁর নিজস্বরীতি কাহিনীর জন্ম দিয়েছেন। এখানে নারীরূপের সৌন্দর্যের মনোহর বর্ণনা থাকলেও তাতে কোন আদিরসাত্মক অশ্লীলতা স্থান পায়নি। ফলে, চার-ইয়ারি কথা সার্থক গল্পের অবিধা পেয়েছে খুব সহজেই। উন্মাদিনী, চোর, প্রবঞ্চক ও পরলোকবাসিনী চরিত্রগুলি সকলেই তাদের স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

আহুতিঃ প্রমথ চৌধুরীর বিচিত্র সব বিষয়ের ঘনঘটায় জমিদার চরিত্রও বাদ যায়নি। জমিদারদের জীবনকাহিনী ভিন্নভাবে অঙ্কন করে তিনি সার্থক হয়েছেন এবং এক স্বতন্ত্র প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। "নানা সমস্যার আঘাতে আঘাতে যে বাংলা মরণদশার মানস নিয়ে ভুগছে- সেই বাংলাকে অন্যান্য সাহিত্যিসাধকদের মতো তিনি গল্পসাহিত্যে ফুটিয়ে তোলেননি-তিনি তাতে বাঙলীর সজীব প্রাণের ধারা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, আবিষ্কার করতে পেরেছেন।"[৮] রুদ্রপুরের পুরানো কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে গল্পকার সেখানে এক ভৌতিক আবহের সৃষ্টি করেছেন। আর

Dhaka University Institutional Repository

এই ভয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পালকিবাহকগণ পথিমধ্যে পালকি থামিয়ে গাজা সেবন করেছে। জমিদার জীবনে ঘটে যাওয়া নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনা এ সময় লেখকের মনে ফুটে উঠেছে। অধুনা ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে যে হীন হত্যাকান্ড সংঘঠিত হয়েছে তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। রুদ্রপুরের বিধবা পত্নী রত্নময়ীর পুত্র হত্যার পর যে রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেছিল, যে সংঘর্ষ বেধেছিল তার প্রতিচ্ছায়া যেন আজও আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই ক্রন্দন ধ্বনি যেন আজও চারদিকে প্রকম্পিত হচ্ছে। রায়বংশের আদি পুরুষ রুদ্রনারায়ণ নবাব সরকারের চাকরী করে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। এদের সম্পত্তি ক্রমে ধনঞ্জয় সরকারের হস্তগত হল। ধুরন্ধর ধনঞ্জয় অর্থের প্রতি ছিল যার প্রচন্ড লোভ; নানা ফন্দি ফিকির করে ক্রমেই প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হল। রুদ্রপুরের জমিদার উগ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর রায়বাবুদের পৈত্রিক ভিটা দখল করে বসল, পুরোটা পারল না কারণ তখনও উগ্রনারায়ণের বিধবা কন্যা রত্নময়ী জীবিত ছিলেন। তাঁর একটি পুত্র ছিল কিরীটচন্দ্র যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আহুতি গল্পের কাহিনী। এদিকে ধনঞ্জয়ের মনে নতুন চিন্তা বাসা বাঁধল, তার যেহেতু একটি কন্যা ও জামাতা ছাড়া কেউ ছিলনা সুতরাং তার এসব ধন-সম্পদ পাহাড়া দেবে কে? অশিক্ষিত ধনঞ্জয়ের মনে বিশ্বাস ছিল সমস্ত টাকা-পয়সা, ধন-দৌলতের সঙ্গে কোন ব্রাহ্মণ শিশুকে যদি দেয়া হয় আর যদি সে অনাহারে মারা যায় তাহলে সেই যক্ষ হয়ে তার ধন-সম্পদ রক্ষা করবে ।

ধনঞ্জয়ের এ চিন্তা বাস্তববায়িত হল তার কন্যার সহযোগিতায়। রত্নময়ীর সৌন্দর্যে ঈর্ষাপরায়ণ রঙ্গিনী স্বামী রতিলালের সহায়তায় কিরীটচন্দ্রকে এনে ধনধৌলতের ঘরে বন্দী করল। অন্যদিকে তার স্বামী রতিলালকেও অন্যঘরে বন্দী করে রাখা হল। পাঁচদিন আটক থাকার পর রতিলাল অতি কষ্টে রত্নময়ীর কাছে ছুটে গিয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করল। এরপর রত্নময়ী এক ধ্বংস যজ্ঞে মেতে উঠল। "সেই দিন দুপুর রাত্তিরে যখন সকলে শুতে গিয়েছে- রত্নময়ী নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে।"[৯] আর সেই আগুনে সবাই পুড়ে মরল। রায়বংশের পৈতৃক ভিটার উপরে আগুন ও নীচে রক্তের নদী বইতে লাগল। এভাবে করুণরসে সিক্ত হয়েছে আহুতি নামক গল্পটি। "রুদ্রপুরের বিধবা রত্নময়ীর পুত্রকে হত্যা ও তার প্রতিক্রিয়ায় রত্নময়ীর অদ্ভুত প্রতিহিংসা সাধন এই ঘটনার বর্ণনায় করুণ ও ভয়ানক রস একত্র প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটির বর্ণনায় এমন

Dhaka University Institutional Repository

বৈপরীত্যের সমাবেশ হয়েছে যে তা আমাদের অসাড় মনকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। জমিদার বংশের পতন ও তা নিয়ে হাহাকার, এ বিষয়ে অজস্র বাংলা গল্প লেখা হয়েছে, কিন্তু এখানে এই ভয়ানক রসের সঙ্গে করুণ রসের পরিণয় সাধিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে।"[১০]

প্রমথ চৌধুরীর আহুতি গল্পটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পের কিছুটা মিল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরী বলেছেন-"Theme- এর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পের সঙ্গে এর সাদৃশ্য সন্নিকট না হলেও সুদূর-বর্তী নয়, -সেই কৃপণ ধনীর যখের হাতে টাকা সঁপে যাবার বীভৎসতা! ধনঞ্জয়, রঙ্গিনী ও রত্নময়ীর চরিত্রচিত্রণে মনো-বিশ্লেষণের একান্ততা সাবলীল ও রসোত্তীর্ণ হয়েছে অবাধে। বরং রুদ্রপুরের ঐতিহ্যচিত্র গল্পটির চেহারায় মহাকাব্যিক উদাত্ততা সংহত করে তুলেছে। এদিক থেকে গল্পের পরিবেশ রবীন্দ্র-গল্পের তুলনায় আরও দৃঢ়; পাষাণ কঠিন, স্তব্ধগম্ভীর। কিন্তু এমন গল্পও গালগল্প হল- না ছোটগল্প হল না, কথকথার অতিবিস্তারে। আর বলা-বাহুল্য, এ-টুকু শিল্পীর ইচ্ছাকৃত।"[১১]

'আহুতি' গল্পে প্রমথ চৌধুরীর বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টির আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং ভাষার নির্মাণ ও বর্ণনাভঙ্গির দিক থেকে তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি বিদ্যুতের আলো বিচ্ছুরণ করে। প্রাচীন জমিদারবংশের ধ্বংসের ইতিহাস চমৎকার আবহ এনে ভয়াল ভয়ঙ্কর রুদ্ধশ্বাস পরিবেশের সৃষ্টি করে স্বতন্ত্র আঙ্গিক গড়ে তুলেছেন। এ গল্পে ধনঞ্জয়ের চরিত্রের লোভাতুর নিষ্ঠুরতা, সেই সাথে তাঁর কন্যার মধ্যে ঈর্ষার আগুন ধ্বংস করে দিয়েছে রুদ্রপুরের জমিদারবংশকে। রত্নময়ীর প্রতিশোধপরায়ণ চরিত্রে ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা লেখক সার্থকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পের শুরুতে রুদ্রপুরের ধ্বংসাবশেষের বর্ণনায় যে ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে, এমন সব শব্দ, চিত্রকল্প তুলে আনা হয়েছে, যা সহজেই ভয়ের সঞ্চার করে পাঠককে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে সাহায্য করে। ধুম্রজাল সৃষ্টি করে উজ্জ্বল বর্ণনার পরিপাট্য আবরণে পুত্রহারা রত্নময়ীর কষ্টে পাঠক ব্যথিত হয় ঠিক, কিন্তু কান্নায় বুক ভাসাতে পারে না কারণ সে সুযোগ প্রমথ চৌধুরী রাখেননি, আবেগের বাড়াবাড়ি তিনি কোথাও করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

একটি সাদা গল্পঃ যে পরিমাণ হৃদয়াবেগ ও সহানুভূতি শরৎচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে লক্ষণীয় তা বীরবলের চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে নেই। তার অর্থ এই নয় যে, তাতে লেখকের সহানুভূতির অভাব বিদ্যমান। আমাদের অধিকাংশ সাহিত্য হৃদয়াবেগ, ভাবাবেগ দ্বারা পরিপূর্ণ। তবে এও সত্য জনপ্রিয়তার জন্য, বাঙালী পাঠককে ধরে রাখার জন্য এসব হৃদয়াবেগ প্রয়োজনীয়। কিন্তু এরপরও প্রমথ চৌধুরী এ পথে যাননি। তিনি গল্পে কোথাও যদি সহানুভূতি কিংবা হৃদয়বোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন- তাকে তিনি বুদ্ধির দ্বারা পরিমিত ও সংযত করে তুলেছেন।

অরক্ষণীয়া মেয়েকে নিয়ে শরৎচন্দ্র হৃদয়াবেগ উজাড় করে দিয়েছেন। লেখকের আবেগে সামিল হয়ে পাঠকও চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে। এমনি এক চরিত্র শ্যামলালের শিক্ষিত কন্যা। আর এই শিক্ষিত সুন্দরী মেয়ের বিয়ের নামে যখন স্ট্যাচুর বিয়ের অভিনয় হল তখন লেখক চোখের জলে বুক ভাসাননি, উজাড় করে দেননি হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য। "বরকনেতে যে মন্ত্র পড়েছিল, তা প্রথমে আমার কানে ঢোকেনি, তার পর হঠাৎ কানে এল ক্ষেত্রপতি বলছেন যদস্তু হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।"[১২] শেষ বাক্যটি পাঠকের হৃদয়ে গিয়ে বাজে। গল্পের যে নায়িকা তার মধ্যেও কোন ভাবাবেগ পরিলক্ষিত হয়নি- খুবই সাধারণভাবে শান্ত সৌম্য মূর্তিতে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল। গল্পের শুরুতে লক্ষ্য করা যায় শ্যামলাল লেখাপড়াকে জীবনের ধ্যানজ্ঞান করে সংসারের অপর কোনদিকে তাঁর তাকানোর অবসর ছিল না। স্ত্রীর প্রতি অবহেলার কারণে তিনি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। এরপর শ্যামলাল ছেলেমেয়ে পন্ডিত করতে গিয়ে সেখানেও বির্পযয় ডেকে আনলেন। ছেলে কলকাতায় পড়তে গিয়ে গ্রেপতার হলে শ্যামলাল তাঁর টাকা পয়সা সবই খোয়ান। মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্য তিনি তখন গ্রামে চলে গেলেন। সেখানে মেয়ের বয়স, মেয়ের বিদ্যা নিয়ে নানারকম কথা শুনতে হল। তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়ে মুক্তি পেতে চাইলেন, কিন্তু উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেল না, শেষে বিয়ে দিতে হল তাঁরই সমবয়সী এক লোকের সাথে। একটা নিদারুণ দুঃখবোধের মধ্যে দিয়ে এ গল্পের কাহিনী এগিয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ব্যাখ্যার সাথে গল্পটি যেন পুরোপুরি মিলে যায়। ছোট ছোট দুঃখ কষ্ট গল্পের সমস্ত অবয়ব জুড়ে, আর গল্পের শেষও পাঠকের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে লেখক চূড়ান্ত ট্র্যাজেডীকে সহজ ভাষায় সংযত ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। "শরৎচন্দ্র একদা বীরবলকে লিখেছিলেন এক একটা অত্যন্ত চাপা লোক যেমন তার দুঃখটাকেও বলবার সময় এমন একটা তাচ্ছিল্যের সুর দেয় যে হঠাৎ মনে হয় যেন সে আর কারও দুঃখটা গল্প করে যাচ্ছে। এর সঙ্গে নিজের যেন কোনো সম্পর্ক নেই। আপনিও বলেন ঠিক তেমনি করে। ইনিয়ে বিনিয়ে কাতরোক্তি কোথাও নেই- অথচ কত বড় না একটা ট্রাজেডী পাঠকের বুকে গিয়ে বাজে। আপনার লেখায় এই সহজ শান্ত রিফাইন্ড বলার ভঙ্গিটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করে।"[১৩]

একটি চরিত্রের হেয়ালী আর একগুয়েমির কারণে কিভাবে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তারই সংযত ও পরিমিত বর্ণনার বহিঃপ্রকাশ 'একটি সাদা গল্প।' শ্রীমতী এ গল্পের এক উজ্জ্বল চরিত্র, লেখাপড়া জানা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীমতীকে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের শিকার হয়ে সামাজিক যূপকাষ্ঠের বলি হতে হয়, ক্ষেত্রপতির মত বৃদ্ধকে বিয়ে করে। সহজ সরল ভঙ্গিতে গড়ে উঠা এই গল্পে রয়েছে এক নিটোল কাহিনী। এ গল্প বর্ণনা করেছিল গল্পকথক সদানন্দ। গল্পকথক গল্পের শুরুতে যে কথা বলেছেন তা প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইঙ্গিত বহন করে "আমি যে গল্প বলতে যাচ্ছি, তা অতি সাদাসিধে। তার ভিতর কোনো নীতিকথা কিংবা ধর্মকথা নেই কোনো সামাজিক সমস্যা নেই- অতএব তার মীমাংসাও নেই, এমন- কি সত্য কথা বলতে গেলে কোনো ঘটনাও নেই।"[১৪] অর্থাৎ তিনি গল্প বলে যেতেন পাঠককে আনন্দ দেয়ার জন্য কোন উপদেশ কিংবা নীতিবাক্য প্রচার না করে গালগল্পের ভঙ্গিতে গল্প রচনা করেছেন। জীবনের গভীর কোন রহস্য উদ্ধারও তাঁর চেষ্টা নয়, রঙে ঢঙে না সাজিয়ে বিশুদ্ধ গল্প বলে গেছেন হালকা চালে, সহজ ভঙ্গিতে, যা ভাষাগঠন, শব্দচয়ন ও নির্মাণশৈলীর দিক থেকে এক অনন্য সাহিত্যিক মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। এ গল্পের নায়িকা শ্রীমতী চরিত্রকে এক ব্যতিক্রম চরিত্র হিসাবে দাঁড় করিয়ে তার চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও ধৈর্য্যের এক চমৎকার ছবি এঁকেছেন। নিমর্ম ভাগ্যের পরিহাসের শিকার হয়েও সে মাথা উঁচু করে থেকেছে পরাজয়েকে মেনে নিয়ে চোখের জলে বুক ভাসায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

রাম ও শ্যামঃ 'রাম ও শ্যাম' গল্পটি গড়ে উঠেছে দুই যমজ ভাইকে কেন্দ্র করে যারা জন্মের পরই নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতা করে নিয়েছিল। এই গল্পটি দ্বারা গল্পকার তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক অন্তঃস্বারশূন্যতার বিষয়টি তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই দুই ভাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতের রাজনীতি চিরন্তন দুর্বলতা, দেশপ্রেমের নামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এসবের বিরুদ্ধে লেখকের দুঃখ ক্ষোভ দুই দিকই প্রকাশিত হয়েছে। স্কুল জীবনের রাম-শ্যাম দক্ষতার সাথে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। স্বদেশী যুগেও তাঁরা দেশের গুণগান করতে লাগলেন পুরোদমে। রাম যখন বললেন-"আমি দেশের চিনি খাব।"[১৫] আর শ্যাম তখন লিখলেন-"আমি বিদেশের নুন খাব না।"[১৬] এভাবে চারদিকে তাঁদের জয়জয়কার পড়ে গেল। লোকে বলল তারা কৃষ্ণার্জুন। দেশের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বহু লোকের চাকরী গেল, বহু যুবক দন্ডিত হল। কিন্তু রাম-শ্যামের দেহ মনে এতে কোন আঘাত লাগল না। কারণ তাঁরা যা বলতেন তা তাদের মনের কথা ছিল না। এরপর রাম-শ্যাম দু'দলের মঞ্চের নায়ক হয়ে রাজনীতির মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। ফলে দেশের লোক দু'দলে বিভক্ত হলেন। যাঁরা রক্ষণশীল তাঁরা হলেন রামপন্থী আর যাঁরা অরক্ষণশীল তাঁরা হলেন শ্যামপন্থী। এরপর দু'দলে লড়াই হল। কিন্তু এই গল্পের শেষে কোন মীমাংসা নেই। এই গল্পের মর‍্যাল গল্পের শেষে পুনশ্চ টীকায় সংযোজিত হয়েছে, তা হল "এ গল্প পড়ে আমার গৃহিণী বললেন, "কই, গল্পত শেষ হল না?" আমি কাষ্ঠ হাসি হেসে উত্তর করলুম, "এ গল্পের মজাইত এই যে, এর শেষ নেই। এ গল্প এ দেশে কবে যে শুরু হয়েছে তা কারো স্মরণ নেই, আর কখনো যে শেষ হবে তার কোনো আশা নেই। এ গল্প যদি কখনো শেষ হত, তা হলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এ পৃথিবীর সব চাইতে বড়ো ট্রাজেডী হত না।"[১৭] রবীন্দ্রনাথ রাম ও শ্যাম গল্প পড়ে বলেছেন-"তোমার শেষ গল্পটি সুতীক্ষ্ণ- ওটা দেশোচিত, কালোচিত এবং পুরুষোচিত। এরকম খরধার এবং সুগঠিত লেখা আর কারো হাত দিয়ে বের হবার জো নেই।"[১৮]

এই গল্পে রাম-শ্যামের চরিত্রের অন্তঃস্বারশূন্যতা চমৎকার ভঙ্গিমার প্রকাশিত। এই চরিত্র দুটির মাধ্যমে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি তাঁর ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার গল্পের শেষে বলা হয়েছে এ গল্পের কোন শেষ নেই। কারণ, ভারতবর্ষের রাজনীতির রূপের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি ইঙ্গিত করে, তার সচেতন উপলব্ধি থেকে তিনি সমাজের এই অসামঞ্জস্যকে মেনে নিতে পারেননি বলেই এই মন্তব্য করেছেন। বিচিত্র চরিত্রের স্রষ্টা সমাজের অসঙ্গতি লক্ষ্য করে রাম-শ্যামকে টেনে এনেছেন। কিন্তু এখানেও তিনি কোন উপদেশ কিংবা নীতিবাক্য প্রচার করেননি, কেবল সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং এই অবস্থা যে যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে, সেদিকেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রসোজ্জ্বল বর্ণনাভঙ্গি আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা রাম-শ্যামের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন এবং চমৎকার ভঙ্গিমার কাহিনী এগিয়ে নিয়েছেন।

অদৃষ্টঃ প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রতিটি গল্পের মধ্যে এক নতুন বিষয়ের অবতারণা করে পাঠককে এক ভিন্ন স্বাদের ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি গল্পই বিষয়ের নতুনত্বে হয়ে উঠেছে ব্যতিক্রম। কৃষ্ণনগরে বেড়ে উঠা প্রমথ চৌধুরী জীবনকে দেখেছেন খুব কাছে থেকে। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে মিশে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁর প্রতিটি গল্পই তাই হয়ে উঠেছে হৃদয়গ্রাহী। সেখানে বাস্তবতা আছে, কিন্তু আবেগের বাড়াবাড়ি নেই। তেমনি এক গল্প অদৃষ্ট- প্রাণবন্ধু দাসের অদৃষ্টের করুণ কাহিনী কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় যে দিন মাসিক তিনশ টাকা বেতনে জমিদারি দেখা শোনার দায়িত্ব পেলেন, সেদিনই প্রাণবন্ধুর অদৃষ্টের লাঞ্ছনা শুরু হল। ভূপেন্দ্রনাথের যেহেতু কোন জমিদারি জ্ঞান ছিল না তাই তিনি কড়াকড়ি কিছু নিয়ম জারি করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আর এতে বেশী বিপদে পড়লেন প্রাণবন্ধু দাস। কারণ তিনি দেরি করে কাজে আসতেন, এসে আয়েশ করে তামাক সাজাতেন তারপর স্ত্রীকে চারপৃষ্ঠার একখানা চিঠি লিখতেন। আর এসব কারণে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর উপর প্রচন্ড রাগ হয়ে অন্য লোক বহাল করার নির্দেশ দিলেও কিছুদিন পর তাঁর রাগ পড়ে গেল। কিন্তু বিপত্তি ঘটল অন্য জায়গায়। প্রাণবন্ধু দাস ইনিয়ে বিনিয়ে বড়বাবুর বদনাম করে স্ত্রীর নিকট চিঠি লেখেন এবং সাথে বড়বাবুর স্ত্রীর নিকটও একখানা চিঠি লেখেন। কিন্তু ভুলক্রমে তার স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিটাই চলে যায় ভূপেন্দ্রনাথের স্ত্রীর কাছে। আর এ চিঠি যখন বড়বাবুর হাতে পড়ে তখন প্রাণবন্ধুর অদৃষ্ট ফেরাবার আর কোন পথই খোলা থাকে না। ছাপার অক্ষরে লেখা এ চিঠি প্রাণবন্ধুর অদৃষ্ট লিপি পাল্টে দিল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রমথ চৌধুরী তাঁর শাণিত কলমে ফরাসি সাহিত্যে বিদগ্ধ অনুশীলিত মনের অধিকারী হয়ে প্রতিটি গল্প ঝকঝকে চকচকে ভাষায় গড়ে তুলেছেন। সংযম আর শৃঙ্খলার আবরণে লেখনী ধারণ করে বিচিত্র ভঙ্গিতে নানা অসদৃশ বিষয় নিয়ে গল্প লিখলেও গল্পের আঙ্গিক ও মূল সুর প্রায় একই। তেমনি এক গল্প 'অদৃষ্ট'। এ গল্পে ভূপেন্দ্রনাথের চরিত্রের দুর্বলতা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তিনি কিভাবে তার প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন এবং তারই জের হিসেবে প্রাণবন্ধু দাসের শেষ পরিণতি বিয়োগান্তক হয়েছিল। প্রাণবন্ধু দাস এজন্য অবশ্য অদৃষ্টকেই দায়ী করেছিলেন। লেখক তাঁর চরিত্রের জটিল বিষয়ের উন্মোচন করে তাঁকে একটি প্রাণবন্ত চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

প্রিন্সঃ 'প্রিন্স' নামক গল্পটি এক প্রেমিক যুবককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সে বার বার প্রেমে পড়ে এবং প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে গল্পের শেষে তাকে নিষ্ঠুর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। আমেরিকায় প্রিন্স এক ধনী কন্যার প্রেমে পড়লেন একই সাথে রাজকন্যা ও রাজ্য পাওয়ার আশায়। আর এই ধনী কন্যা যেহেতু সর্বক্ষণ তার মায়ের সঙ্গে থাকত তাই তাকে প্রেম নিবেদন ছিল এক দুরূহ কাজ। কেবল হাইডপার্কে ঘোড়া চালনোর সময় সে একা থাকত বলে প্রিন্স তার বন্ধুর পরামর্শে এক তেজী ঘোড়া নিয়ে সেখানে গিয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে এক মহা বিড়ম্বনায় পড়েছিল। তেজী ঘোড়া চারপা তুলে এমন লাফাতে লাগল যে তাঁর মুখ দিয়ে কথা না বের হয়ে নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে লাগল। প্রিন্সের বন্ধুর হাসি পাচ্ছিল। কারণ তিনি জানতেন প্রিন্সের এসব জখম সেরে গেলেই সে নতুন করে প্রেমে পড়বে। ঘটলও তাই শুধু পূর্ব প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ তাঁর নাকের উপর একটা বিশ্রি দাগ থেকে গেল।

প্রেমের ব্যঙ্গাত্মক চিত্রাঙ্কন 'প্রিন্স' গল্পের মূল বিষয়। প্রেমের চিরন্তন রূপকে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করে প্রেমের রোমান্টিক দিকের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে প্রেম নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর উপহাস করেছেন। প্রিন্সের বার বার প্রেমে পড়া এবং

Dhaka University Institutional Repository

এক কন্যাকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হওয়া- এতে প্রিন্সের চরিত্রের প্রেম নিবেদনের বিষয়টি ধরা পড়েছে। এ গল্পে কোন নিটোল কাহিনী না থাকলেও প্রমথ চৌধুরীর প্রেমভাবনা ও প্রেম নিয়ে ব্যঙ্গ করার বিষয়টি ধরা পড়েছে।

বীরপুরুষের লাঞ্ছনাঃ যৌবনে পুরুষ যে নারীজাতির প্রতি বেশ আগ্রহী থাকে তারই এক ব্যঙ্গাত্মক কাহিনী অঙ্কিত হয়েছে 'বীর পুরুষের লাঞ্ছনা' নামক গল্পটিতে । কল্পনার রং দিয়ে তিনি নারীর প্রতি এই দুর্বার আকর্ষণকে অতিরঞ্জিত করেননি। বরং এক নিমর্ম বাস্তবতা দিয়ে তাকে ব্যঙ্গে কশাঘাতে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্ত্রীকর্তৃক পুরুষ নিগ্রহের এক করুণ কাহিনী এই গল্পের বিষয়। লেখক বিলেতে থাকাকালীন সময়ে বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়তে আসা এক সুদর্শন যুবকের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই বন্ধুটির নারীজাতির হৃদয় জয় করার ইচ্ছা ছিল প্রবল। নীচ, হীন চাকরানী সকল নারীর প্রতি ছিল তাঁর দুর্বার আকর্ষণ। একদিন সেই বন্ধুর সঙ্গে মেলায় গেলে সেখানে মাথায় রুমাল বাঁধা, হাতে চাবুক সমেত এক যুবতীর সঙ্গে খুব সহজেই তাঁর বন্ধুত্ব জমে উঠল। এর মধ্যে দেখা গেল বন্ধুটি ডিগবাজি খেয়ে মাটির উপর পড়লেন মুখ থুবড়ে আর মেয়েটি এক লাফে তাঁর পিঠে চড়ে চাবুক দিয়ে পিটাতে লাগলেন। লেখক বহু কষ্টে মেয়েটির কবল থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন। তখন যুবতীটি লেখককে বললেন যদি তিনি না বলতেন তাঁর মত কুস্তিগীর ও ঘোড়সওয়ার পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই তাহলে তাঁকে এই প্রকাশ্য লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত না। এই বলে ঐ যুবতীটি ঘোড়ার দোলার একটি কাঠের ঘোড়ায় চড়ে তার উপর সোজা এক পায়ে দাঁড়িয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। আকাশে লাফিলে উঠে জোড়া ডিগাবাজি খেয়ে আবার সেই অশ্বপৃষ্ঠে এসে দাঁড়ালেন। দর্শকরা সব আনন্দে হাততালি দিল। পরে জানা গেল মেয়েটি এক প্রসিদ্ধ সার্কাস গার্ল। এভাবে এ গল্পে পুরুষ নিগ্রহের এক ট্র্যাজেডী পরিলক্ষিত হয়।

পুরুষ চরিত্রের রূপও যে প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না তার সার্থক বহিঃপ্রকাশ 'বীরপুরুষের লাঞ্ছনা' নামক গল্পটি। লেখক গল্প লিখতে গিয়ে যে কল্পনার জাল বিস্তার করেন, সেই কল্পনাশক্তির বহিঃপ্রকাশ আর তাঁর আশ্চর্য সৃষ্টি ক্ষমতা দিয়ে রঙে রূপে উজ্জ্বল রেখার বীরপুরুষের নিগ্রহের কাহিনী অঙ্কন করেছেন। বীরপুরুষের লাঞ্ছনা ও প্রিন্স গল্প দুটির মূল সুর একই, তাহল

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমের প্রতি বক্রোক্তি। নিজের শক্তির মিথ্যে পরিচয় দিতে গিয়ে এক মেয়ের কাছে লাঞ্ছিত হওয়ার মধ্য দিয়ে চরিত্রের অন্তঃস্বারশূন্যতা প্রমাণিত হয়, এ গল্পে তেমন কোন নিটোল কাহিনী নেই।

অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধিঃ 'অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি' নামক গল্পে অবনীভূষণের যে পরিচয় প্রথমে পাওয়া যায় তাহল নারীজাতির প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা। তিনি শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজের হিতসাধনের ব্রত নিয়ে নারীজাতি থেকে দূরে থাকতেন। কিন্তু তিনি তার ব্রত ভঙ্গ করে অচিরেই বিয়ে করে স্ত্রীর পুরোপুরি ভক্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু বেশীদিন তাঁর এই ভক্তি স্থায়ী হল না, তিনি এ মোহকে মিথ্যা মনে করে আবার পূর্বের কাজে ফিরে গেলেন। কিন্তু তাতেও শান্তি পেলেন না। কাজ থেকেও অবসর নিলেন। এরই মধ্যে এক বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে বাইজী বেনজীরের মুখে ঠুংরী শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী করলেন। কিন্তু ছয়মাস পর বাইজী চলে গেলেন। এরপর অবনীভূষণকে নারীর মোহ পেয়ে বসল। তিনি একজনের পর একজন নারী গ্রহণ করতে লাগলেন। এ সময় তাঁর প্রথম স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা জেগে উঠল। অবনীভূষণ সাধনার নিমগ্ন হলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন সাধনার সময়কালে মাসাবধি তিনি কোন নারীর মুখ দর্শন করবেন না। স্ত্রীর কঠিন রোগেও তিনি তাঁর ব্রত ভঙ্গ করেননি। যেদিন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হল সেদিনই তিনি সিদ্ধি লাভ করলেন।

402423

'অবণীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি' গল্পে অবণীভূষণের চরিত্রের জটিলতার দিক নির্দেশ করা হয়েছে। অবনীভূষণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপন্ডিত হলেও তাঁর মধ্যে বার বার মত পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মানুষের মনের জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিক এ গল্পে লক্ষ্য করা যায়। অতিকথনের বিস্তার থাকায় এখানে বিশুদ্ধ গল্প কমই পাওয়া গেছে। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের কতগুলো বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্যপ্রীতি বুদ্ধিমত্তা ও পান্ডিত্যের সম্মিলন এ গল্পে দেখা যায়। তিনি যে রূপ ও শক্তির চিরকাল ভক্ত ছিলেন তার বহিঃপ্রকাশও এ গল্পে রয়েছে। অবণীভূষণ শিক্ষিত আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও রোমান্স বিমুখ ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সহযাত্রীঃ শাক্ত সামন্ততান্ত্রিক জীবনের উপাখ্যান ও প্রমথ চৌধুরী লেখায় লক্ষ্য করা যায়। 'সহযাত্রী' গল্পে সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর এক সুদর্শন জমিদার যে কিনা ট্রেনে ট্রেনে বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পালিয়ে যাওয়া স্ত্রীকে ধরার জন্য । আর তাদেরকে ধরতে পারলেই গুলি করে স্ত্রীকে এবং স্ত্রী যার সঙ্গে পালিয়েছে তাকে সহ পরকালে পাঠাবেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্যের কারণেই সিতিকণ্ঠসিংহ ঠাকুরকে শেষ পর্যন্ত ব্যঙ্গাত্মক চরিত্রে রূপান্তর করেছেন। অথচ তিনি চাইলেই তাঁকে বিরহের আগুনে পুরিয়ে খাঁটি সোনা করে গড়ে তুলে পাঠকের জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি- শেষ পর্যন্ত জমিদার বাবুকে পাগল হিসেবে উপস্থিত করে হাস্যরসের সঞ্চার করেছেন।

সিতিকণ্ঠ ঠাকুরের রূপ সৌন্দর্য প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত বাকভঙ্গির মাধ্যমে ঝলসিত হয়েছে। তিনি এ গল্পের নায়ক, রূপে গুণে সবদিকে তাকে মহিমান্বিত চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরী তা করেননি তাঁর মধ্যে হাস্য ও ভীতি সঞ্চার করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে শেষ পর্যন্ত তাঁকে উন্মাদ চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। শরীর মনে শক্ত সামর্থ্য এই জমিদার চরিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী তাঁর যৌবনধর্মের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে নেতিয়ে পড়া ঘুমন্ত বাঙালীকে জাগাতে চেয়েছেন। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সিতিকণ্ঠ ঠাকুরের প্রতি লেখক তাঁর সমবেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর এই সহানুভূতি ধরে না রেখে তাকে উন্মাদ হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর বিড়ম্বিত জীবনের বেদনাকে ম্লান করে দিয়েছেন।

সারদাদাদার সন্ন্যাসঃ 'সারদাদাদার সন্ন্যাস' গল্পে সন্ন্যাসীদের ভন্ডামী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সারদাদাদা প্রথমে বিনা দোষে জেল খেটে তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হলে তিনি সন্ন্যাসে দীক্ষা নিলেন। কিন্তু সেখানে প্রতারণা শিকার হয়ে পুনরায় জেলখাটার উপক্রম হয়েছিল। সারদাদাদাকে অবলম্বন করে প্রমথ চৌধুরী তিনটি গল্প লিখেছেন। নীল-লোহিত কিংবা ঘোষালের মত সারদাদাদা কথার মারপ্যাঁচ আর বুদ্ধির খেলায় অত ক্ষুরধার না হলেও বানিয়ে গল্প বলায় তিনিও কম পারঙ্গম ছিলেন না। প্রেম সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর যে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিচয় এ গল্পে লক্ষণীয়। সারদাদাদার জীবনের অতীত কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। এ গল্পে ধারাবাহিকতা

Dhaka University Institutional Repository

তেমন নেই। গল্পের শেষে মন্তব্য করা হয়েছে। "এ গল্প আগাগোড়া মিথ্যে"[১৯] তাই গল্পটি পাঠক যে পরিমাণ আগ্রহ নিয়ে পাঠ করেন শেষে এসে আর সে আগ্রহ থাকে না, যখন জানা যায় গল্পটি আগাগোড়া মিথ্যে।

সারদাদাদার সত্য গল্প ঃ সারদাদাদা জমিদার ক্রিংকারীর বাড়ীতে থাকাকালীন অবস্থায় কৃপণ ব্যক্তি নকুড়সাকে কিভাবে জব্দ করেছিল সেই কাহিনী নিয়ে গল্পটি রচিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর অন্যান্য গল্পগুলি থেকে এ গল্পের কাহিনী পৃথক। সারদাদাদা জমিদার ক্রিংকারী বাবুর সহায়তায় দারোগা নিয়ে আসলে নকুড়সা ভয় পেয়ে এক হাজার টাকা দিয়ে উদ্ধার পায়। সারদাদাদা নকুড়াসাকে বানিয়ে এমন সব মিথ্যে কথা বলে যে নকুড়াসাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। এ গল্পে সারদাদাদার চরিত্রের মিথ্যেবাদিতা, নারীচরিত্রের ভীরুতা এবং নকুড়সার কৃপণতা অঙ্কন করা হয়েছে। গল্পটি কাহিনীগত দিক থেকে অন্য গল্পের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য থাকলেও আঙ্গিকগত দিক একই।

বড়োবাবুর বড়োদিনঃ 'বড়োবাবুর বড়োদিন' গল্পে নীতিবাগীশ মধ্যবিত্তের চরিত্রের চারিত্রিক বিশুদ্ধতা দুর্গে প্রমথ চৌধুরী ফাটল আবিষ্কার করেছেন। বড়োবাবুকে শেষকালে স্ত্রীর কাছে অপদস্থ হতে হয়েছে। বড়োবাবুর চরিত্রের ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনা প্রমথ চৌধুরীর সুগভীর মেধা আর প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। এ গল্পের শেষে লেখক বলেছেন "এ গল্পের Moral এই যে, পৃথিবীতে ভাল লোকেরই যত মন্দ হয়- এই হচ্ছে ভগবানের বিচার।"[২০] প্রমথ চৌধুরীর বিভিন্ন গল্পে বর্ণিত চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করলে চরিত্রগুলির মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অধিকাংশ চরিত্র প্রথম দিকে পাঠকের সহানুভূতি অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত সেই গাম্ভীর্য ধরে রাখতে পারে না। তেমনি একটি চরিত্র বড়োবাবু যে তার স্ত্রীকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন, আর এই ভালোবাসা থেকে তাঁর মধ্যে সন্দেহ প্রবণতার জন্ম হয়েছিল যে জন্য তাঁকে স্ত্রীর কাছে অপদস্থ হতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংসপুরীঃ এ গল্পের পটভূমি হচ্ছে বিলেতের গ্রামের ভাঙাচোরা এক বাড়ী নিয়ে। পোরলক গ্রাম থেকে গল্পকার তাঁর বন্ধুর সাথে এই ধ্বংসপুরী দেখতে যান। প্রকান্ড এক পাথয়ে গড়া বাড়ী যা জীর্ণ না হলেও কিছু অংশ ছিল ভাঙাচোরা। বাড়ীর সত্যিকার ইতিহাস তেমন কেউ জানেন না। এ বাড়ী সম্পর্কে যা জানা যায় তাহল এ বাড়ীর মালিক একজন মৃত যোদ্ধা। তিনি যুদ্ধে গেলে এই বাড়ী এবং তাঁর স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বন্ধুকে দিয়ে যান। ফিরে এসে দেখেন বন্ধু শয়নমন্দিরেও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। বাড়ীর মালিক ঐ লোকটিকে হত্যা করলেন, আর তাঁর স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করলেন। এরপর মহিলা অর্ধ্বউন্মাদ হয়ে কিছুদিন বেঁচে থেকে একসময় আত্মহত্যা করলেন। গল্পটি রূপকথার ঢঙে গড়ে উঠলেও এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত আবহ সৃষ্টি করে গল্পটিকে প্রমথ চৌধুরী অন্য গল্প থেকে পৃথক করেছেন। অন্যান্য গল্পের মত এ গল্প ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কিংবা হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে গড়ে উঠেনি। গল্পটি হালকা চালে গড়ে না উঠার কারণেও অন্যান্য গল্প থেকে একে সহজেই আলাদা করা যায়। নিরাবেগ শিল্পী লেখক ভিন্ন বিষয় নিয়ে চমৎকার ব্যঞ্জনায় ধ্বংসপুরীর মালিক, তাঁর স্ত্রী ও বন্ধুর জটিল জীবন ও চরিত্র নির্মাণ করেছেন।

মন্ত্রশক্তিঃ 'মন্ত্রশক্তি' গল্পে দৈবশক্তির উপর জোর দেয়া হয়েছে। ঈশ্বর লেঠেলের অপরিসীম শক্তিকে অন্য সবাই যাদুর শক্তি বলে অভিহিত করত। তাঁর শরীরে এমন শক্তি ছিল যে তাঁকে কেউ হারাতে পারতনা। এক শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনায় গল্পের কাহিনী এগিয়ে গেছে। গল্প শেষে লেখকের মন্তব্য "আমি বুঝলুম লেঠেলদের কথা ঠিক। ঈশ্বরের গায়ে যিনি ভর করেন তাঁরই নাম মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ দেবতা। শুধু লাঠি খেলাতেই নয়, পৃথিবীর সব খেলাতেই- যথা সাহিত্যের খেলাতে, পলিটিক্সের খেলাতে তিনিই দিগ্‌বিজয়ী হন যাঁর শরীরে এই দৈবশক্তি ভর করে । এ শক্তি যে কি, যাঁদের শরীরে তা নেই, তাঁরা জানেন না। আর যাঁদের শরীরে আছে, তাঁরাও জানেন না।"[২১]

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের অন্যতম বাহন হচ্ছে চরিত্রগুলি বুদ্ধিমত্তার অধিকারী । ঈশ্বর পাটনী সবার দৃষ্টি কেড়েছিল তাঁর অপরিসীম দৈবশক্তির কারণে । লাঠি খেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গল্প একটা টান টান উত্তেজনা নিয়ে এগিয়ে যায়। ঈশ্বর পাটনী চমৎকার নৈপুণ্যে আর লাঠি খেলার

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষতার কারণে একের পর এক সকলেই তাঁর কাছে হার মানে। শেষে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে সকলে মিলে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কাহিনী অত বিস্তার লাভ না করলেও স্বল্প পরিসরে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমার পরিপাট্য গঠনে গল্প শেষ হয়েছে। সকলে মিলে ঈশ্বর পাটনীর শক্তি যাদু-মন্তরের প্রভাব বলে অভিহিত করেছেন। গল্পে ঈশ্বর পাটনীর চরিত্র এত আলো বিচ্ছুরণ করে যে তা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ প্রমথ চৌধুরী জগত জীবন সম্পর্কে যে একটি উপাদানের সম্মিলন ঘটিয়েছেন তারই সার্থক বহিঃপ্রকাশ 'মন্ত্রশক্তি'। গল্পে লাঠি খেলার কলাকৌশলের নিখুঁত বর্ণনার মাধ্যমে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাবহুল জীবনের পরিচয় দিয়েছেন।

যখঃ ইতিপূর্বে 'আহুতি' গল্পে যখ নিয়ে ভয়ানক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য 'যখ' গল্পটি তেমন ভয়ানক নয়। শিক্ষার অভাব আর কুসংস্কার মানুষকে নানা ধরনের অসৎ কাজে যেমন প্ররোচিত করত, তেমনি নানা ধরণের কল্প কাহিনীরও জন্ম দিত। তেমন সব কাহিনীর বহিঃপ্রকাশ আলোচ্য 'যখ' নামক গল্পটি। আলোক চন্দ্রকে লেখা চিঠিতে গল্পকথক রমা ঠাকুরের কাছ থেকে 'যখ' সম্পর্কে যে গল্প তারই বর্ণনা এ গল্পের পটভূমি। গল্পে প্রকৃতির চমৎকার বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। "চাঁদের আলোয় গাছপালা সব হাসছে, আর আলোকলতায় ছাওয়া ফুলের গাছগুলো দেখতে মনে হচ্ছে যেন সব সোনার তারে জড়ানো।"[২২] প্রকৃতির এমন উজ্জ্বল বর্ণনা তাঁর অনেক গল্পে দেখা যায়। এ গল্পের কলেবর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন গল্পটি এত ছোট্ট যে একটি ছোট এলাচের খোসার ভিতর তাকে পোরা যায় । 'যখ' গল্পে রমা ঠাকুর কেমন করে ব্রাহ্মণের ছেলে যখ হয়ে তামার ঘড়া পাহারা দিচ্ছে তারই বর্ণনা দিয়েছেন খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে। যখ নিয়ে ইতিপূর্বে গল্প লেখার কারণে লেখক হয়তো গল্পটিকে সম্প্রসারিত রূপ দিতে চাননি। এ গল্পে অতিপ্রাকৃতের বিষয়ে তেমন কোন ভয়াবহতা সৃষ্টি হয়নি।

স্বল্প গল্প ঃ এ গল্পেও জমিদার চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। জমিদার তাঁর অর্থ সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হলেও তাঁর জমিদারি আভিজাত্য তখনও বর্তমান ছিল। গল্পে লেখক দেখিয়েছেন কুমার বাহাদুরের Sense of humour সব সময় সজাগ ছিল। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

করলে দেখা যায় লেখকের Sense of humour পুরো মাত্রায় বর্তমান থাকত, যার প্রকাশ অধিকাংশ গল্পে দেখা যায়। এ গল্পে আর একটি চরিত্র হলো পল্টনী সাহেব, ট্রেনে যার সঙ্গে কুমার বাহাদুরের সাক্ষাত হয়েছিল। আর এই পল্টনী সাহেবের কাছ থেকে সিগারেট চুরি করে খেয়ে যে মানসিক শান্তি নষ্ট হয়েছিল, মনোকষ্টের শিকার হয়েছিলেন তাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন চুরি আর করবেন না, প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন নির্বাহ করবেন। কিন্তু গল্পকারের দৃঢ় বিশ্বাস কুমার বাহাদুর যদি কোনদিন ফকিরও হন তবু তাঁর মত দৃগ্ধপোষ্য মন নিয়ে ভিক্ষা করা সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র পরিসরের গল্প, এখানে কাহিনী প্রাধান্য না পেলেও দুজনের কথোপকথনের মাধ্যমে চুরি ও ভিক্ষা-বৃত্তির প্রভেদ অঙ্কনের দ্বারা নিঃস্ব জমিদারদের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

জুড়ি দৃশ্যঃ 'জুড়ি দৃশ্য' গল্পে দুটি ঘটনার বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়, দুটি ঘটনার প্রেক্ষাপট প্রায় এক। অর্থাৎ পর পর দুটি ঘটনার একজন জয়ন্তীবাবু ও আর একজন কুলদাবাবু, এদের জীবনের একরকম চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। গল্পে দেখান হয়েছে মানুষ কত কঠিন বাস্তবের মধ্যেও বেঁচে থাকে। একটা ভয়ানক ক্লেদাক্ত পরিবেশ গল্পটির অবয়ব জুড়ে। গল্প শেষে লেখক মন্তব্য করেছেন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা যেমন কঠিন, মরাও তেমনি সোজা নয়। গল্পে বর্ণিত দুটি চরিত্রের যে ভয়ঙ্কর বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা বেঁচে থাকার পক্ষে কঠিন হলেও তাদের বাঁচতে হয়েছে। কারণ মৃত্যু ব্যাপারটাও অত সহজ নয়, জীবনের যে কোন কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হলেও মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়, লেখক এ গল্পের মাধ্যমে তাই বুঝাতে চেয়েছেন।

ঝোট্টন ও লোট্টনঃ মানুষের বিচিত্র চরিত্র সম্পর্কে আলোকপাত হচ্ছে 'ঝোট্টন ও লোট্টন' এর মূল বিষয়। স্বার্থের জন্য একটা মানুষ কত বিচিত্র ধরণের আচরণ করতে পারে চিনিবাসের চরিত্র হচ্ছে তার উদাহরণ। যে চিনিবাস অসুস্থ লোট্টনকে ঘাড়ে করে হাসপাতালে নিয়ে যায় তখন তাকে অনায়াসে দেবতা হিসেবে আখ্যায়িত করা গেলেও লোট্টনের মৃত্যুর পর যখন তার লোটা ও কম্বলের মালিকানা নিয়ে তার ভাই ঝোট্টনের সাথে ঝগড়া বাধিয়ে দেয় তখন আবার তাকে পশু বলে ভ্রম হয়। লেখক অবশ্য এ মীমাংসায় বলেছেন- "আমার মনে হয় যে, চিনিবাস দেবতাও নয়

Dhaka University Institutional Repository

পশুও নয়- শুধু মানুষ; যে অর্থে ঝোট্টন-লোট্টনও মানুষ তুমি- আমিও মানুষ।"[২৩] লেখক যে মানুষের বিচিত্র রূপের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তার সার্থক বহিঃপ্রকাশ এই গল্পটি।

মেরি ক্রিসমাসঃ প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বিষয়ের গভীরে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় বিচিত্র সব চরিত্রের সমাবেশে গল্পগুলি হয়েছে সমৃদ্ধ। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী গল্প বলার চমৎকার ভঙ্গিমা, শব্দ ব্যবহারের নিপুণ দক্ষতা, প্রকৃতি আর রূপ বর্ণনার কারুকার্যে প্রতিটি গল্পই এক চমৎকার আলো বিচ্ছুরণ করেছে, সেই আলোয় পাঠক বার বার চমকিত হয়েছে, বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয় লেখকের প্রতিভার বিচিত্র সমাবেশের নৈপুণ্যগুণে। 'মেরি ক্রিসমাস' গল্পে সুন্দরী নায়িকার কোন বাস্তব উপস্থিতি না থাকলেও গল্পকথকের কল্পনায় সে ধরা দিত যে কোন অসতর্ক মুহূর্তেই। গল্পকথক লন্ডনে থাকা অবস্থায় যে প্রেম করেছেন সেই প্রেমের স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে বেড়াত, প্রেমের কথা ভুলতে পারতেন না বলে সব সময় সেই প্রেমিকাকে কল্পনায় দেখতে পেতেন। তাঁর মনে হত তাঁর প্রেমিকা তাঁর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসব কল্পনা তাঁর কাছে সত্যি বলে মনে হত। পুরোপুরি ভূতের গল্প না হলেও গল্পটি একটি ভৌতিক আবহ নিয়ে গড়ে উঠেছে। থিয়েটার দেখতে গিয়ে প্রেমিকার আগমন, আবার জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধার রূপান্তর একটা অতিপ্রাকৃত অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

ফার্স্টক্লাস ভূতঃ 'ফার্স্টক্লাস ভূত' গল্পটি সারদাদাদাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। এ গল্পে সারদাদাদাকে একবার এক সাহেব ভূতের খপ্পরে পরে জামা কাপড় সব হারিয়ে একমাসের মেয়াদে জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক লেখক প্রমথ চৌধুরী ভূত-প্রেতে আদৌ বিশ্বাস করতেন না। তাই ভূতের গল্প লিখতে গিয়ে ভূতের অস্তিত্ব যে নেই তা বোঝাতে চেয়েছেন। যে কারণে প্রমথ চৌধুরী এসব গল্পে বার বার বলেছেন এসবই হচ্ছে বানানো গল্প । কারণ সাহিত্যে মিথ্যে কথা চলে।

'মেরি ক্রিসমাস' গল্পে ভূত বিষয়টি সরাসরি না আসলেও 'ফার্স্টক্লাস ভূত' নামক গল্পে সারদাদাদা এক সাহেব ভূতের পাল্লায় পড়ে কিভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন তার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সারদাদাদা ট্রেনের ফাস্টক্লাসে উঠে সাহেব ভূতের খপ্পরে পড়ে জামা কাপড় হারিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

মারধর খাওয়ার পর একমাসের মেয়াদে জেল খাটতে হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী যা বিশ্বাস করতেন তা তিনি গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতেন। এ গল্পে সারদাদাদা সত্য মিথ্যা গল্প বানিয়ে বলায় ওস্তাদ। প্রমথ চৌধুরীও যে প্রচলিত এ পথে চলতে বেশী পছন্দ করতেন, তার প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর লেখা গল্পে। তিনি মনে করতেন- "কেননা মিথ্যা কথা আদালতে চলে না, কিন্তু গল্পে দিবারাত্র চলে।"[২৪] গল্পে তিনি কল্পলোকের জগতে বাস করে পাঠককে আনন্দ দিতে চেয়েছেন যে কারণে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লেখক ভূত নিয়ে গল্প লিখেছেন কিন্তু তাতে যে একবিন্দু সত্য নেই তাও বার বার প্রমাণ করেছেন। অর্থাৎ ভূতের অস্তিত্ব উড়িয়ে দিয়েছেন।

'সরু মোটা' ঃ 'সরু মোটা' একটা হাস্য রসাত্মক ব্যঙ্গ গল্প। গল্পে নীলকণ্ঠবাবুর দুই বন্ধুর এক বন্ধু নবীনমোহন, তার মোটা হওয়ায় হাস্যকর বিড়াম্বনায় কাহিনী বর্ণনা করে মোটা না হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। স্বল্প পরিসরে লেখা এ গল্পের মূল কথা হল অতিভোজনের দ্বারা শরীরকে মোটা করতে না দেয়া । এ গল্পে প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রচলিত পথ থেকে একটু সরে এসেছেন। তিনি গল্প লিখেছেন পাঠককে আনন্দ দেয়ার জন্য কোন নীতিবাক্য প্রচারের দায়িত্ব নেননি। কিন্তু এ গল্পে মোটা মানুষের বিড়ম্বনা লক্ষ্য করে তিনি মোটা না হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন ও সেই সঙ্গে বলেছেন অতিভোজন না করতে ও চলে ফিরে বেড়াতে।

সীতাপতি রায়ঃ 'সীতাপতি রায়' গল্প গড়ে উঠেছে মানুষের মনের জটিলতাকে কেন্দ্র করে। সীতাপতি রায়ের জীবনের উত্থান পতন, জেল খাটা, যাযাবর জীবনযাপন ও তাকে কেন্দ্র করে তার ছাত্র পটোল বিশ্বাস এবং তার বাবা কৃপণ ব্যক্তি অটল বিশ্বাসকে নিয়ে গল্পরসের সঞ্চার হয়েছে। সীতাপতি ইংরেজী জানতেন এবং সঙ্গীতে তাঁর দক্ষতা ছিল তাই পটোলের বিমাতা কিশোরীকে পড়ানোর দায়িত্ব পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন। কিশোরী ও সীতাপতির প্রেমকে প্রধান অবলম্বন না করে প্রমথ চৌধুরী তাঁর সহজাত প্রবণতায় কাহিনীকে অন্যদিকে ধাবিত করেছেন। যে কারণে গল্পটি প্রেমের গল্প হয়ে উঠতে পারেনি। কিশোরী ও সীতাপতি উভয়ের মনের জটিলতা এ গল্পের মূল বিষয়, কোন একটি সিদ্ধান্তে তাঁরা স্থির থাকতে পারেননি। সীতাপতি চিরদিন মুক্তির উপায় খুঁজেছেন, আর তা হচ্ছে মনের মুক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

দিদিমার গল্পঃ 'দিদিমার গল্প'ও 'আহুতি' গল্পের মতো প্রতিশোধ স্পৃহার এক রোমাঞ্চ কাহিনী। এক ভয়াবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাহিনী এগিয়ে গেছে চমৎকার ভঙ্গিমায়। ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলেও আবেগময়তা, গতানুগতিকতা না থাকার কারণে এই গল্পটিও শ্রেষ্ঠ গল্পের অভিধা পেতে পারেনি। অথচ গল্পটি যেভাবে এগিয়েছে তাতে এর মধ্যে কিছু নাকিকান্না কিংবা আবেগময়তা সংযোগ করা গেলেই এটি শ্রেষ্ঠ গল্প হতে পারত। ভৈরবনারায়ণের লুপ্ত জমিদারির উপর দাঁড়িয়ে যে পাপ করেছেন তাঁর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন সর্বানন্দ। আর এই পাপের পতন থেকে ভৈরবনারায়ণের সতী স্ত্রী মহালক্ষ্মী দেবীও তাঁকে রক্ষা করতে পারেননি। প্রমথ চৌধুরী তাঁর দীপ্ত প্রতিভা দ্বারা সংযত ও সুন্দর বাকভঙ্গির সমন্বয়ে এ গল্পের কাহিনীকে চমকপ্রদ করে তুলেছেন।

দিদিমার গল্পে দিদিমার চরিত্র তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নয়। এ গল্পের কাহিনীতে ভৈরবনারায়ণের ভন্ডামী ও তার ধর্মপরায়ণ স্বামী ভক্তিপরায়ণ নির্বোধ সতী সাধ্বী স্ত্রী মহালক্ষ্মী দেবী ও লাঞ্ছিতা অতশী এবং সর্বানন্দের প্রতিশোধপরায়ণ চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে। এ গল্পে প্রধান চরিত্র হচ্ছে সর্বানন্দ। ষোল কি সতের বছরের রূপবতী অতশীকে কামার্ত ভৈরবনারায়ণ লাঞ্ছিত করে যে পাপ করেছিল সর্বানন্দ নিজ হাতে সেই ঘোরতর অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন। এ গল্পে প্রমথ চৌধুরীর ধর্মভাবনার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়ে তাঁর সংস্কারমুক্ত মন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্গের লোভে মানুষ যে ধর্ম কর্ম করে সেই লোকদের প্রতি তাঁর নেতিবাচক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সৌন্দর্যচেতনা, সংযত সুন্দর বর্ণনাভঙ্গি প্রতিশোধ চরিতার্থতা, ধর্মভাবনা সব মিলিয়ে এ গল্পে এক উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরণ করে প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করেছে। এ গল্পে ভয়াবহ ঘটনাগুলি গতিময়তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। জমিদারদের ঐশ্বর্য ও পাপের ছবি অঙ্কনের সাথে প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা কাহিনীর ধারাবাহিকতা ও জমাট আবহ গল্পটিকে শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পূজার বলি ঃ 'পূজার বলি' গল্পও একটি বিশুদ্ধ গল্প, যেখানে জীবনের অপার রহস্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী বেশ কিছু গল্পে জীবনের নিটোল কাহিনী রয়েছে। পূজার বলি তেমনি একটি গল্প। রাগের মাথায় কথা বলা ও ঝোঁকের মাথায় কাজ করা কিভাবে মানুষের জীবনে মহাপ্রলয় ঘটাতে পারে, গল্পটির মূল বিষয় তাই। সেই সাথে ত্যাগ স্বীকারও একটি বিষয়। মোটকথা পূজার বলি গল্পটি একটি বিশুদ্ধ গল্প। জীবনের বিয়োগান্তক পরিণতি নিয়ে চমৎকার একটি গল্প 'পূজার বলি'। রঙ্গ-ব্যঙ্গ আর হাস্য-পরিহাস থেকে প্রমথ চৌধুরী কিছুটা সরে এসে 'পূজার বলি' গল্প রচনা করেছেন।

'সম্পাদক ও বন্ধু' গল্পে সুরনাথ বন্দোপাধ্যায় অতুলানন্দের কবিতা বাজে, একথা জেনেও তার কাগজে ছেপেছেন, তার কারণ তা না করলে অতুলের মায়ের Illusion ভেঙ্গে যাবে। ললিতার সঙ্গেই সুরনাথের বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু ললিতা সুরনাথকে ভুলতে পারেনি বলে তাঁর ছেলেকে সুরনাথের আদর্শে মানুষ করে তুলতে চায়। 'ভাববার কথা' গল্পকে কোন গল্প না বলে প্রবন্ধ বলাই ভাল, কারণ এখানে দুই বন্ধুর কথোপকথন আছে কোন গল্প নেই। 'ট্রাজেডীর সূত্রপাত' গল্পটি ভিন্ন ব্যঞ্জনায় গড়ে উঠেছে। প্রৌঢ় অধ্যাপকের কুমারী ছাত্রীর প্রতি অনুরাগের কাহিনী পরিহাসমূলক হয়েও হয়নি। অধ্যাপকের মোহাবেশকে লেখক তাঁর সহানুভূতি দ্বারা প্রচ্ছন্ন পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। 'গল্প লেখা' গল্পকেও প্রবন্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আর এ গল্প থেকে প্রমথ চৌধুরী কিছু অভিমত সম্পর্কে জানা যায়। গল্পটি পড়লে মনে হয় প্রমথ চৌধুরী তার কিছু তত্ত্বকে স্থাপন করার জন্যই গল্পটি রচনা করেছেন।

প্রমথ চৌধুরী গল্পলেখক হিসেবে কেবল সাদামাটা গল্পকে প্রাধান্য দেননি, তিনি প্রতিটি গল্পের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনা তাঁর মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। 'এ্যাডভেঞ্চার স্থলে,' 'এ্যাডভেঞ্চার জলে' তাই গল্প হয়ে উঠেনি। 'সোনার গাছ হীরের ফুল' গল্পে তেমন কোন কাহিনী নেই। তবে এই গল্পে একটি গভীর তত্ত্বকথা রয়েছে তাহল মানুষের বিকৃত রূপের অবসান করে হৃদয়কে সুন্দর করে গড়ে তুললেই সোনার গাছে হীরের ফুল গড়ে তুলতে পারবে। 'প্রবাস স্মৃতি' গল্পে বসন্ত ঋতুতে দুই বন্ধু একটা প্রচ্ছন্ন মন নিয়ে পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর যাকে দেখছিল তাকেই একটা মন্তব্য ছুড়ে দিচ্ছিল। এমন করতে গিয়ে শেষে বিপদে পড়তে গিয়েও শেষে রক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

পায়। 'চাহার দরবেশ' এ চারজনের বিয়ে না করার চারটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যে কোন বিষয় নিয়ে প্রমথ চৌধুরী ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারতেন। 'প্রগতি রহস্য' তেমনি একটা গল্প। যেখানে প্রগতি কি এ নিয়ে নানা ধরনের কথা বলতে গিয়ে চমৎকার হাস্যরসের সঞ্চার হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি আলোচনা করে যা পাওয়া গেল তাহল হৃদয়াবেগের সংযত প্রকাশ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হাস্য-পরিহাস, তর্ক-বিতর্ক সর্বোপরি বুদ্ধির খেলা তাঁর গল্পের মূল বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১। প্রমথ চৌধুরী, গল্প সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১ম সংস্করণ, ১৩৪৮, কলিকাতা, ১৩৯৪, পৃঃ ৫২৯।

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭

৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭

৪। শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১ম প্রকাশ, ১৯৬২, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ২৬৭।

৫। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বীরবল ও বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যলোক, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ২৯।

৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩।

৭। প্রমথ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩০।

৮। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রমথ চৌধুরী, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৪, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ১৭৭।

৯। প্রমথ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০১।

১০। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪।

১১। শ্রীভূদেব চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৩।

১২। প্রমথ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩২।

১৩। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৩।

১৪। প্রমথ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২০।

১৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮০।

১৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮০।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৯।

১৮। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩০।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬৪।

২০। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯।

২১। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৬।

২২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬০।

২৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০৩।

২৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১১।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নীল-লোহিত ও ঘোষাল সম্পর্কিত গল্প

নীল-লোহিত প্রমথ চৌধরীর অন্যতম সৃষ্টি। মিথ্যা কথা বলায় নীল-লোহিত ছিল পারঙ্গম, মিথ্যে কথাগুলোকে তিনি এমনভাবে সাজিয়ে বলতেন, তার মধ্যে এমন রস ও আর্টের সমন্বয় ঘটাতেন যে অন্য সবাই তা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যেত। সত্য মিথ্যার ভেদজ্ঞান তাঁর লোপ পেত গল্প বলার সময়, গল্পের নেশা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসত যে তিনি অনায়াসে গল্পকে টেনে যেমন বড় করে তুলতেন তেমনি বিভিন্ন রকম ঘটনার বর্ণনা করে গল্পকে চমকপ্রদ করে তুলতেন। আর এ সমস্ত গল্পে মজলিসী আবহাওয়া রয়েছে। মজলিসে যেমন এক বা একাধিক শ্রোতা থাকে এবং তাদেরকে কেন্দ্র করে, শ্রোতার গল্প শোনার আগ্রহ থেকে গল্প বহুদূর এগিয়ে চলে। প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা ছিল মননধর্মী। তাঁর সব রচনায়ই তাঁর অপরিসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। নীল-লোহিত আর ঘোষাল তাঁর অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টি। গল্পবলিয়ে হিসেবে এদের তুলনা মেলা ভার। নীল-লোহিত সম্পর্কে লেখক বলেছেন "নীল-লোহিতের আত্মকাহিনী আগাগোড়া অলীক হলেও, তাঁর সকল কাহিনীর ভিতর একটা জিনিস ফুটে উঠত সে হচ্ছে তাঁর মুক্ত আত্মা।"[১] তবে তাঁর গল্পে গল্পরস যত আছে তার চেয়ে বেশী আছে বাক্য ও বাক্যরস। প্রমথ চৌধুরীর যে কোন গল্প পড়লেই নিটোল কাহিনীর চেয়ে কথার ফুলঝুরি ও তর্কের জটাজাল নিঃসন্দেহে বেশী চোখে পড়ে। নীল-লোহিতকে কেন্দ্র করে লেখা গল্পগুলি ছিল নাগরিক সাহিত্যের বহিঃপ্রকাশ । আর এসব নাগরিক সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি যে পরিমাণ আয়োজন করেছেন তাতে তাঁর বিদগ্ধ পান্ডিত্য সহজেই চোখে পড়ে। তিনি মন জিনিসটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন কম। সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে। গুরু একটি বিষয়কে লঘু করে দিয়েছেন কাহিনী ভিন্ন খাতে মোড় দিয়ে। বুদ্ধির মারপ্যাঁচ দিয়ে ঘটনাকে এগিয়ে নিয়েছেন। শেষ করেছেন হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন-"তোমার ছোটো গল্প পড়ে চেখভের ছোট গল্প মনে পড়ল। যা মুখে এসেছে তাই বলে গেছ হাল্‌কা চালে। এতে আলবোলার ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। এ রকম কিছুই না লিখতে সাহসের দরকার করে। দেশের লোক সাহিত্যের ভুরিভোজন ভালোবাসে-তারা ভাববে ফাঁকি দিয়েছ- কিম্বা ভাববে ঠাট্টা।"[২]

Dhaka University Institutional Repository

নীল-লোহিতঃ নীল-লোহিত নামক গল্পটিতে বিশুদ্ধ গল্পরসের সন্ধান পাওয়া যায়। লেখকের মেধার সবটুকু যেন স্পষ্ট হয়ে উঠে নীল-লোহিতের চরিত্র অঙ্কনে। লেখকের মতে নীল-লোহিতের মত আদর্শ কথক আর নেই। লেখকের ভাষায় "সুনিপুণ চিত্রকরের তুলির প্রতি আঁচড় যেমন চিত্রকে রেখার পর রেখায় ফুটিয়ে তোলে, নীল-লোহিতও কথার পর কথায় তাঁর গল্প তেমনি ফুটিয়ে তুলতেন। তাঁর মুখের প্রতি কথাটি ছিল ঐ চিত্রশিল্পীর হাতের তুলির আঁচড়।"[৩] আর নীল-লোহিতের সব গল্পই ছিল বানানো, তাঁকে সবাই বলত মিথ্যাবাদী কিন্তু তাঁর গল্প শুনে খুব আনন্দ পেত। আর নীল-লোহিত যে সব গল্প বলতেন তাঁর নায়ক তিনি নিজে। সব রকম কাজেই তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি অসংখ্যবার বিপদে পড়েছেন এবং প্রতিবার তাঁর দক্ষতা গুণে উদ্ধার পেয়েছেন। নীল-লোহিত নানা স্বদেশী ডাকাতির গল্প করতেন আর সে সব গল্প লোকমুখে এমন ছড়িয়ে পড়ল যে পুলিশের কান পর্যন্ত গড়ালো। নীল-লোহিত ডাকাতির চার্জে গ্রেপতার হলেন। যদিও পুলিশ পরে তদন্ত করে দেখলেন যে নীল-লোহিতের ঘটনার সাথে বাস্তবের কোন মিল নেই, এর সবই ছিল বানানো। আর নীল-লোহিতের বন্ধুরাও স্বাক্ষ্য দিলেন যে তাঁর তুল্য মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

এরপর নীল-লোহিত গল্প বলা ছাড়লেন, চাকরী নিয়ে সংসারী হলেন। তিনি বাস করতেন কল্পনার জগতে, আর এ জগৎ থেকে যখন তাকে নামানো হল তখন দিন দিন তাঁর অবনতি হতে থাকল। অবশ্য লোকজনের মতে তিনি সত্যবাদী হয়েছেন। কিন্তু লেখকের মতে তিনি মিথ্যার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছেন। লেখকের ভাষায়- "নীল-লোহিতের ভিতর যে মানুষ ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে- যা টিকে রয়েছে তা হচ্ছে সংসারের সার ঘানি ঘোরাবার একটা রক্তমাংসের যন্ত্র মাত্র।"[৪]

'নীল-লোহিত' একটি পরিণত ছোটগল্প প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির খেলা, তাঁর শিল্পী মনের পরিচয় তিনি নীল-লোহিতের চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। নীল-লোহিতের সৌন্দর্য-জ্ঞান, মেধা, গল্প বলার চমৎকার ভঙ্গিমা সবই যেন প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য প্রতিভাকে উজ্জ্বল করে তোলে। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার ঋদ্ধ হয়ে তিনি নানা চরিত্রের সমাবেশ করেছেন, আর এসব চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন তার সাথে সমকালীন অন্য লেখকদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়

Dhaka University Institutional Repository

না। নীল-লোহিত চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে লেখক তাঁর মনোভাব প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছেন। নীল-লোহিত কল্পনার জগতে বাস করতেন, আর সেই জগত থেকেই নানা রকম গল্প বানিয়ে বলতেন। আর এসব গল্প মিথ্যে হলেও লেখকের কোন আপত্তি নেই যদি তাতে নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়। কারণ, প্রমথ চৌধুরীর মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দ দেয়া। যে কারণে নীল-লোহিতের পরিবর্তনকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। লেখকের মনে হয়েছে নীল-লোহিত গল্প বলা ছেড়ে দেওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। নীল-লোহিতের অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টি করে লেখক তার উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। 'নীল-লোহিত' গল্প ছাড়া ও অন্যান্য গল্পে নীল-লোহিত তাঁর বুদ্ধি, সৌন্দর্য, তর্ক ও চমৎকার বাচনভঙ্গি দ্বারা পাঠককে চমকিত করে একটি উজ্জ্বল প্রাণবন্ত চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলাঃ তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক অন্তঃস্বারশূন্যতার দিক কখনও প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি এড়ায়নি। নীল-লোহিতকে ডেলিগেট করে সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশনে এনে সেখানে পাদুকা নিক্ষেপ বাস্তব ঘটনারই কাল্পনিক বিন্যাস। কেননা ইতিপূর্বে সুরাটে কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের তর্ক-বিতর্ক, হাতাহাতি ও জুতা ছুড়ার মত ঘটনাও ঘটেছিল। প্রমথ চৌধুরী সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কল্পনা আর রোমান্স মিশিয়ে চমৎকার এক কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। নীল-লোহিতের কংগ্রেস ক্যাম্পে জায়গা না হওয়ায় সুরাট সুন্দরীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ এবং সুন্দরীর সহায়তায় স্ত্রীলোক সেজে কংগ্রেসে গমন সব যেন এক অপূর্ব উত্তেজনা ও বিমুগ্ধতায় এগিয়ে গেছে। তারপর সেখানে গিয়ে এই সুরাট সুন্দরীর গৃহে যে হোমরা-চোমরা লোকটি তাকে অপমান করেছিল তার উদ্দেশ্যে পাদুকানিক্ষেপ গল্পটিকে আরও বেশী চমকপ্রদ করে তুলেছে। তারপর নীল-লোহিত এ সুন্দরীর সহায়তায় দেশ ফিরে আসেন। গল্প শেষে শ্রোতারা যখন ঐ অসাধারণ সুন্দরীর ছবি দেখতে চেয়েছেন, তখন বুদ্ধিমান নীল-লোহিত নূরজাহানের ছবি দেখতে বলেছেন। নূরজাহানের ছবি দেখলেই সেই সুরাট সুন্দরীকে দেখতে পাওয়া যাবে এ দুজন দেখতে একই রকম। "এ গল্পের গঠনকৌশল অনবদ্য, ত্রুটিহীন। আপাতবিরোধী পরিবেশের মধ্যে অপরিচয়ের রস ও কৌতুকের উপাদান আমদানি করে, বাস্তব ঘটনার সঙ্গে রোমান্সকাহিনীকে নিপুণভাবে জুড়ে দিয়ে গল্পকথক এমনি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যাতে শ্রোতারা সত্যমিথ্যার ভেদ

Dhaka University Institutional Repository

ভুলে যায়। বাস্তব থেকে রোমান্সে কথকের উত্তরণ অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে, আবার আকস্মিকতার চমক সৃষ্টি করে তাঁর বাস্তবে প্রত্যাবর্তন। সমস্তটাকে ধরে আছে গল্পকথকের কথননৈপুণ্য আর গভীর আত্মপ্রত্যয়।"[৫]

নীল-লোহিতকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গল্পগুলি মজলিসী আঙ্গিকে গড়ে উঠেছে। কয়েকজনকে নিয়ে জমজমাট আড্ডায় যে মজলিসী রসের আসর বসত তাতে কোন অমার্জিত রস উৎসারিত না হয়ে বুদ্ধির খেলায় ও বাকচাতুরীর অপূর্ব যাদুতে পাঠককে চমকিত করত। এ গল্পটির মাধ্যমেও নীল-লোহিত চরিত্রের সাহায্যে তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক অন্তঃস্বারশূন্যতার বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর পরিচ্ছন্ন যুক্তিবাদী মন নিয়ে যেমন সুরাটসুন্দরীর সৌন্দর্য ও নারীসুলভ কোমল চরিত্রের বর্ণনা করেছেন, তেমনি রাজনৈতিক অন্তঃস্বারশূন্যতা বোঝানোর জন্য যে চরিত্রকে টেনে এনেছেন তা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি কাড়ে। বাস্তব-অবাস্তব, সম্ভব-অসম্ভবের, সীমা রেখা দিয়ে তিনি তাঁর গল্পগুলোকে আবদ্ধ না রেখে শিল্পী-মনের বুদ্ধি, আর দীপ্তিময় আঙ্গিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এক একটি চরিত্র এত চমৎকার মহিমায় গড়েছেন যে, সে সকল চরিত্র বুদ্ধি, চিন্তা আর প্রাণ প্রাচুর্যে জীবন্ত রূপ ধারণ করেছে। আর মূল চরিত্রকে কেন্দ্র করে অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলোও আলো বিচ্ছুরণ করেছে স্বমহিমায়। নীল-লোহিতের চরিত্র এবং তাঁকে কেন্দ্র করে সুরাটসুন্দরীর অপূর্ব সৌন্দর্য ও প্রেম, কথার যাদু, গঠন পরিকল্পনা সব মিলিয়ে গল্পটিকে মনোহর করে তুলেছেন।

নীল-লোহিতে স্বয়ম্বরঃ নীল-লোহিতের গল্প বলায় ছিল অসম্ভব দক্ষতা। সম্ভব-অসম্ভব যাবতীয় বিষয় নিয়ে হাস্য কৌতুক, পরিহাসের মাধ্যমে চমৎকার, মনোমুগ্ধকর গল্প তিনি বলতে পারতেন। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের স্বয়ম্বর সভার ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনা এ গল্পের বিষয়। রাজা ঋষভরঞ্জন রায়ের কন্যা মালশ্রী পাত্র বেছে নিতে গিয়ে নীল-লোহিতের গলায় মালা পরালেন। কিন্তু মালশ্রীর পিতার এতে ঘোর আপত্তি । মালশ্রীর পিতার মতে নীল-লোহিত যেহেতু ব্রাহ্মণ সেহেতু তাঁর পূর্ব স্ত্রী যদি ব্রাহ্মণ হত তবেই এ বিয়ে সম্ভব হত। মিথ্যে গল্পে পটু নীল-লোহিত তৎক্ষণাৎ বলে ফেললেন তাঁর প্রথম স্ত্রী কুলীন ব্রাহ্মণ। আর মালশ্রী একথা শুনে বললেন প্রাণ থাকতে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

এ বিয়ে করবেন না। গল্প শেষ হলে নীল-লোহিতের বন্ধুরা তাঁকে নানা প্রশ্নে বিদ্ধ করতে থাকলেন। এভাবে একটি করুণ কাহিনী শেষে হাস্যরসের সঞ্চার করে গতানুগতিক পথ পরিত্যাগ করে নিজস্ব পথ অনুসরণ করল। "মজলিসের গাল-গল্প যেমন নানা অবান্তর আলোচনার দ্বারা কন্টকিত, তেমনি এই গল্পটিও নবতর- জীবন- সমিতির সভ্যদের আলাপ-আলোচনা ও নানা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনার দ্বারা জর্জরিত। মূল গল্পের দিকে চলতে চলতে লেখক কেবলই এদিক ওদিক তাকিয়েছেন, এবং নানা চিত্র ও চরিত্রের বিদ্রূপাত্মক সরস বর্ণনা দিয়েই গল্পের প্রায় অর্ধেক জমিয়ে তুলেছেন। মূল স্বয়ম্বয় গল্পে পৌঁছোবার কোনো তাগিদ বা আগ্রহ যেন তাঁর নেই। নীল-লোহিত নবতর, জীবন-সমিতির সভ্যদের উদ্দেশ্য বলেছেন ; 'তোমাদের দেখছি, আসল ঘটনার চাইতে তার উপসর্গ সম্বন্ধেই কৌতুহলী বেশী।... গল্প যাক চুলোয়, তার আশেপাশের বর্ণনাই হল মূল। ছবি বাদ দিয়ে তার ফ্রেমের রূপই দেখতে চাও।' আসলে এই স্বভাব শুধু নীল-লোহিততের শ্রোতাদের নয়, এই স্বভাব হচ্ছে গল্পের লেখক স্বয়ং প্রমথ চৌধুরীরও।"[৬]

প্রমথ চৌধুরীর নীল-লোহিত চরিত্রটি অঙ্কন করে তাঁর চরিত্রের গুণ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রুচি-অরুচির পরিচয় তুলে ধরে তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা পছন্দ-অপছন্দের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যে বিচিত্র বিষয় নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত মনন কল্পনার প্রচ্ছদ এঁকেছেন তাতে তাঁর স্বাতন্ত্র্যধর্মী রূপ ফুটে উঠেছে চমৎকার ভঙ্গিমায়। আর ভিন্নতর উপস্থাপনা ও বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ হলেও গল্পগুলোর আঙ্গিকগত দিক অর্থাৎ সব গল্পই রূপসৌন্দর্য ভাষা বিন্যাস, কথার চাতুরী, শব্দের নৈপুণ্যে ছিল কারুকাজ খচিত। গল্পে স্বয়ম্বর সভার বর্ণনার মাধ্যমে সেখানে উপস্থিত জ্ঞানবীর, কর্মবীর, লিপিবীর এ সমস্ত চরিত্র উপস্থাপনের দ্বারা সমাজের অন্তঃস্বারশূন্যতার দিক প্রকাশ করা হয়েছে। একই সাথে তিনি মালশ্রী চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন। সর্বোপরি এ গল্পে বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ, চরিত্রের অসঙ্গতি ও ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ও একটি অভিনব বিষয় প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের কল্পিত স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করে প্রমথ চৌধুরী তাঁর স্বতন্ত্র সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ গল্প আলোচনায় জীবেন্দ্র সিংহ রায় বলেছেন,-"গল্পের শেষে মালশ্রীর অসঙ্গত ও খেলো আচরণ পাঠকের প্রত্যাশাকে কঠিন আঘাত হানে। যখন বাঁদরজাতীয় বিভিন্ন পানিপ্রার্থীকে উপেক্ষা করে মালশ্রী নীল-লোহিতকে বরণ করলো, তখন তার নারীজীবনকে ঘিরে পাঠকের সহানুভূতি ঘন হয়ে উঠল।... এমনি চরম মুহূর্তে স্বয়ং মালশ্রীকে একটি 'বাঁদরে' পরিণত করে লেখক পাঠকের দুর্বলতা ও প্রত্যাশাকে উপহাস করলেন ! বস্তত ; গল্পের চিরাচরিত উপসংহারকে ও মানুষের জীবন-সমস্যার পরিচিত পরিণতিকে নিয়ে এইভাবে বিদ্রূপ করাই প্রমথ চৌধুরীর স্বভাব। গল্পের এই জাতীয় পরিকল্পনার ও রূপায়ণ দেখে সকল পাঠকের পক্ষে খুশি না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ পেট ভরাবার মতো কিছু মিষ্টান্ন মুখের কাছে নিয়ে ছিনিয়ে আনার রসিকতাটা সকল পাঠকের পক্ষে সুখকর হবে এমন আশা করা অন্যায়। কিন্তু যারা হৃদয়ের সজলতার চেয়ে বুদ্ধির হীরকদ্যুতিকে বেশ পছন্দ করেন, তাদের কাছে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের রচনা রীতির অভিনবত্ব নিশ্চয়ই অখুশির কারণ হবে না।"[৭]

নীল-লোহিতের আদিপ্রেমঃ 'নীল-লোহিতের আদিপ্রেম' গল্পটিও গড়ে উঠেছে এক সভায় যেখানে উপস্থিত ছিলেন, উদীয়মান কবি শ্রীভূষণ, অনিলচন্দ্র, নীল-লোহিত। সেখানে আলোচনার বিষয় ছিল প্রেম। পাঁচ বৎসর বয়সে এক বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে নীল-লোহিত প্রেমে পড়েছিলেন। তাঁর সেই প্রেমকাহিনী ছিল অসম্ভব রোমন্সে ভরা। পরদিন স্কুলে গিয়ে এক ভয়ানক বিপদের হাত থেকে ঐ মেয়েকে বাঁচালেন। মেয়েটির চোখ দেখে বুঝলেন মেয়েটিও তাঁর প্রেমে পড়েছে। বেড়ার ফাঁক গলে একটা বন্ধুকের গুলি মেয়েটির দিকে ছুটে আসলে সেই ছুটে আসা গুলিকে প্রথমে স্লেট দিয়ে আটকালেন এবং স্লেট ভেদ করলে গুলিটি হাত দিয়ে ধরে ফেললেন। এভাবে তিনি মেয়েটিকে রক্ষা করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গল্পটি পড়ে মন্তব্য করেছেন,-"তোমার গল্পগুলি আর একবার পড়লুম। ইতিপূর্ব্বেও পড়েচি। ঠিক যেন তোমার সনেটেরই মত- পালিশ করা, ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ। উজ্জ্বলতার বাতায়ন মগজের তিনতলা মহলে মধ্যাহ্নের আলো সেখানে অনাবৃত। রসাক্ত সুমিষ্টতা দোতলায়, সেখানে রসনার লোলুপতা। তোমার লেখনী সে পাড়া মাড়াতে চায় না।"[৮]

Dhaka University Institutional Repository

নীল-লোহিতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা গল্পগুলিতে যেমন তর্ক-বিতর্ক কৌতুক আর ব্যঙ্গ রয়েছে, তেমনি বাস্তব-অবস্তাব নানা কাহিনী নিয়ে গল্প জমে উঠেছে। লেখকের মতে নীল-লোহিত যে কল্পনার জগতে বাস করতেন আকাশ-কুসুম আজগুবি বিষয়কে অবলম্বন করতেন পাঠককে আনন্দ দেয়ার উদ্দেশ্য। পাঁচ বৎসর বয়সে নীল লোহিতের প্রেমে পড়া বাস্তবের কোন ঘটনা নয়, নীল-লোহিতের অদ্ভুত কল্পনাপ্রবণ মনের উদ্ভূদ ভাবনাকে শিল্পসুন্দর সুষমার সাবলীল বর্ণনার গুণে এমন হৃদয়গ্রাহী হয়েছে যে পাঠক এ থেকে নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছে।

ফরমায়েশি গল্পঃ সমাজের সকল শ্রেণী সকল প্রকার মানুষের সাথে প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় ছিল। তাঁর রচনায় জমিদার, ধনী, দরিদ্র, পাগল, চোর, সব বিষয়ের সংযোগ সাধিত হয়েছে। সমাজের ছোট-বড় ভাল-মন্দ নানা ঘটনার তিনি বর্ণনা করেছেন, আর এ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কখনও অতীতে ফিরে গিয়েছেন, জমিদারের জীবন কাহিনী মূর্ত করে তুলেছেন। এমনি একটি গল্প 'ফরমায়েশি গল্প।' সেখানে গল্পবলিয়ে ঘোষাল আর শ্রোতা মকদমপুর জমিদার রায়মহাশয় ও অন্যান্য অনেকে। বৈঠকী আমেজে গড়ে উঠা গল্পটি নানা তর্ক-বিতর্ক, প্রশ্নের মাধ্যমে এক চমৎকার ভঙ্গিমায় গল্পের কাহিনী এগিয়ে যায়। "গল্পবলিয়ে ঘোষাল। গল্প বলতে বলতে ডিগবাজী খেতে সে ওস্তাদ ; তাঁর মুরুব্বি জমিদার রায় মশায় ধমকে উঠেন ঃ 'ঘোষাল, তোর গল্প বন্ধ কর, নইলে কত যে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলবি, তার আর আদি অন্ত নেই। আজ তোর ঘাড়ে রসিক নয়, মিথ্যে কথার ভূত চেপেছে, ঝাঁটা দিয়ে না ঝাড়লে তা নামবে না।' তবুও শেষ পর্যন্ত তার ভূত ঝাড়বার জন্যে ঝাঁটা পড়লো না (শুধু উজ্জ্বলনীলমনির একটু দাঁত-খিচুনি দেখা গেলো।) -যদিও ঘোষালের হাতে পড়ে প্রেমের গল্প ততক্ষণে ভূতের গল্পে পরিণত হয়েছে। এতেই মনে হয়, ঘোষাল যতই মিথ্যে- বলিয়ে হোক্- তার সষ্টার সহানুভূতি যে আদায় করেছে, তা না হলে ঝাঁটা এড়ানো তার পক্ষে সাধ্য ছিল না।"[৯]

এক চমৎকার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় এগিয়ে গেছে এই গল্পের কাহিনী । ঝড় দুযোর্গের রাতে এক ব্রাহ্মণ সন্তান মন্দিরে আশ্রয় নিলে সেখানে এক মানবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। কথার যাদুকর ঘোষাল সে মানবীকে কখনও বিধবা, কখনও সধবা, আবার কখনও মুসলমান, ব্রাহ্মণ নানা

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয় দিতে থাকলেন। শেষে বললেন ঐ ব্রাহ্মণ সন্তান আসলে ঐ মেয়েটির স্বামী মাথায় ঘোমটা থাকায় ব্রাহ্মণ সন্তান তাঁকে চিনতে পারেননি। ঘোমটা সরে গেলে চিনতে পেয়ে যখন তাকে আলিঙ্গন করতে গেলেন তখন কিছুই পেলেন না কেবল দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল। একটি নিটোল প্রেমের গল্প প্রমথ চৌধুরীর স্বভাব অনুযায়ী ভূতের গল্পে পরিণত হল। রোমান্টিক হাস্যরস, গল্প শোনার আগ্রহ, তর্ক-বিতর্ক কাহিনী বিন্যাস সব মিলিয়ে চমৎকার গল্প এটি। "ফরমায়েশি গল্প- এ বীরবল বাংলা রোমান্টিক গল্প-কাহিনী-উপন্যাসের শবব্যবচ্ছেদ করে তার মধ্যে যে অসম্ভাব্য হাস্যকর গাঁজাখুরি উপাদান আছে, সেগুলিকে টেনে বার করেছেন এবং বাস্তবের কঠিন ভূমিতে তাদের আছড়ে ফেলেছেন। মকদমপুরের জমিদার রায়মশায়ের বৈঠকখানায় সান্ধ্য আসরে ইয়ার-বক্সির সভায় চাটুকার ঘোষাল রায়মশায়ের ফরমায়েস অনুযায়ী প্রেমের গল্প বলতে শুরু করল। তারপর রায়মশায় ও সভাপন্ডিতের নির্দেশানুযায়ী জাতকুল-মান বাঁচিয়ে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিয়ে দিল। বিরোধী উক্তি-প্রত্যুক্তি ও বিচিত্র দাবির সমন্বয়ে ঘোষাল যে- বস্তুটি উপস্থিত করল, তা অত্যন্ত হাস্যকর। এ-গল্পে স্পষ্টই বাংলা রোমান্সের উপর কশাঘাত করা হয়েছে।"[১০]

নাগরিকতার উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ, মজলিসী আসরে জমজমাট তর্ক আর কথার পর কথায় এগিয়ে নেয়া কাহিনীর সমৃদ্ধ ভান্ডারের নায়ক ঘোষাল, গল্প বলার চমৎকার ভঙ্গিমা যার করায়ত্ত। মকদমপুরের জমিদার রায়মহাশয় ও তাঁর সভাসদ হচ্ছে গল্পের শ্রোতা যারা প্রশ্নবাণে ঘোষালকে বিপর্যস্ত করলেও পরাস্ত করতে পারেনি। নীল-লোহিতের মত ঘোষালও প্রমথ চৌধুরীর এক অনবদ্য সৃষ্টি। কথার পিঠে কথার ছন্দে, শব্দে বর্ণে রেখায় বর্ণনা এমন চমৎকার ভঙ্গিমার এগিয়ে গেছে, যা বিচিত্র রকমের রস সৃষ্টি করে চরিত্রের মৌলিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ঘোষালের বর্ণিত চরিত্রের মধ্যে হৃদয়াবেগ থাকলেও তা প্রমথ চৌধুরীর স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্যের কারণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে ভিন্ন পথে ধাবিত হয়েছে। ফরমায়েশি গল্পে যে আঙ্গিক বা গঠন কৌশল ফুটে উঠেছে তা যেন প্রচলিত মত ও পথকে বিদ্রূপ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষালের হেঁয়ালিঃ 'ঘোষালের হেঁয়ালি' গল্পে আছে তীব্র পরিহাসবোধ, বিদ্রূপাত্মক মনোভাব, ভাবালুতাবর্জিত সংস্কারহীন মনোভাব, উজ্জ্বল ও চটুল বুদ্ধির সচ্ছল, স্বচ্ছন্দ ও সতেজ রূপের বহিঃপ্রকাশ । এই গল্পে আছে তর্ক এবং তর্কের সূত্র ধরে এগিয়ে যাওয়া। এ গল্পে বর্ণিত সখীরানীর মতে ঘোষালের দু আনা গল্প বাকী চৌদ্দ আনা তর্ক অর্থাৎ বাক্যি। জীবেন্দ সিংহ রায়ের মতে-"সখীরানীর এই মন্তব্য বস্তুতঃ প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কারণ ঘোষাল প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। বীরবলের যে- কোনো গল্প পড়লেই নিটোল কাহিনীর চেয়ে কথার ফুলঝুড়ি ও তর্কের জটাজাল নিঃসন্দেহে বেশী করে চোখে পড়ে।"[১১] এই গল্পের কথা-পীঠে ঘোষাল রায়মহাশয় থেকে চাকরিচ্যুত হয়েছেন সেই কথাই লেখকের কাছে বলেছেন। মুখবন্ধে গিয়ে তাঁর জীবনের ঘটে যাওয়া কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন এটি উপন্যাস নয় ইতিহাস। গল্পকার এ গল্পে কোন বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন তা বোঝা যায় না। সমাজে মুখস্থ করা বিদ্যাধরীদের প্রতি লেখকের যে বিদ্বেষ ছিল তা কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ প্রমথ চৌধুরী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষিত লোকই সুশিক্ষিত নয়। কৃষ্ণনগরে বেড়ে উঠা বীরবলের পারিবারিক পরিবেশে ধর্মের বেড়াজাল খুব একটা ছিল না। তাই ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ এ গল্পে দেখতে পাওয়া যায়।

এ গল্প ঘোষালের পরিহাসমুখর তর্কের আবর্তে এগিয়ে গেছে। প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ গল্পেই নারীচরিত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় দেবী মূর্তি ইত্যাদি বিষয়গুলি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। সঙ্গীতপ্রিয় প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি গল্পে সঙ্গীতের বিষয় এসেছে এবং 'ঘোষালের হেঁয়ালি' গল্পেও সঙ্গীতের বিষয় এসেছে। এ গল্পে সখীরানী ঠাকুরানী, প্রফেসর চরিত্র অন্য গল্পে বর্ণিত চরিত্রগুলির মত ততটা আলো বিচ্ছুরণ করতে পারেনি। সখীরানী যে ঘোষাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে তাঁর গল্পের দু-আনা হল গল্প আর বাকি চৌদ্দ আনা বাক্যি, কথাগুলো সত্য। কারণ এ গল্পে তর্ক-বিতর্ক এত বেশী যে গল্পরস তেমন নেই বললেই চলে। এখানে প্রফেসর চরিত্রের অন্তঃস্বারশূন্যতার বা চরিত্রটিকে পশু জাতীয় করে তোলার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বীণাবাইঃ 'বীণাবাই' গল্পটি ঘোষালকে নিয়ে লেখা । লেখক শুরুতে বলেছেন "এ গল্প আমার ঘোষালের মুখে শোনা।"[১২] গল্পের বেশ কিছু অংশ জুড়ে আছে গানের সুরের মাহাত্ম্য, নানা কথকতা, অভিমত কিন্তু শেষ দিকে নাটকীয়তার বহিঃপ্রকাশ । 'বীণাবাই' গল্পটি বীণাবাই- এর ভাইকে কেন্দ্র করে রচিত, ভাই ছিল তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। গল্প শেষে মনে হয় বীণাবাই এতদিন এই ভাইয়ের জন্য, ভাইকে দেখার জন্যই বেঁচেছিলেন। ঘোষাল বীণাবাই- এর নিকট গানের তামিল নেওয়ার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করেন। গান সম্পর্কে ঘোষালের অভিমত "আমি গান-বাজনার সায়েন্স জানি নে। জানি শুধু আর্ট। আর আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রে সায়েন্স আর্ট থেকে বেরিয়েছে- আর্ট সায়েন্স থেকে বেরোয় নি।"[১৩] গল্প শেষে লেখক ঘোষালকে জিজ্ঞেস করলেন "এ গল্প সত্য, না মিথ্যা ? ঘোষাল বললে এক সঙ্গে দুই-ই।"[১৪] বীণাবাই গল্প সম্পর্কে শ্রীভূদেব চৌধুরী বলেছেন- "বীণাবাই গল্পের সমাপ্তি প্রণয়- স্বপ্নে মন্থর করুণ রোমান্স এর পরিণতি পেতে পারত। উপন্যাসের মতো অতি বিস্তারিত করেছেন শিল্পী এই গল্পকে ; বীণা ও বীণার দাদা, বীণা ও মাস্টারমশায়ঃ বীণার সংগীত-সাধনা, এবং বীণা ও ঘোষাল এই চারটি পৃথক কাহিনীর সম্ভাবনাকে শিল্পী তাঁর কথাকতায় বৈদগ্ধ্যগুণে একসূত্রে টেনে বেঁধেছেন ; গল্পের দেহে বিস্তার থাকলেও শিথিলতা নেই, একটি কাহিনীর মুখে আর একটি কাহিনী ঠিক বসে গেছে, যেন একই ভাঙ্গা মনির এ-পিঠ ও-পিঠ। ফলে গল্প-দেহে ছোটগল্পোচিত সংসক্তির অভাব ঘটে থাকলেও জীবন-তপ্ত Pathos রোমান্টিক স্বাদুতায় জমাট বাঁধতে বাধা ছিল না। কিন্তু শিল্পী তা হতে দিলেন না, গল্পের অশেষ ব্যঞ্জনাময় সুচিহ্নিত শেষ কে ইচ্ছে করে যেন দুহাতে চটকে দিলেন। একটু, তাতে বিশুদ্ধ আর্ট- এর গায়ে যেন সায়েন্স- এর জাতিহর স্পর্শ লাগল ; মৃদু-বিগাঢ় ইমোশনের নিস্তব্ধতা 'ঈষৎ চঞ্চল' হয়ে উঠল বুদ্ধির তির্যক প্রতিফলনে ।"[১৫]

এ গল্পে কাহিনী থাকলেও ছোটগল্পের যে সিরিয়াসনেস তা গল্প শেষে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখানেও গল্পবলিয়ে ঘোষাল। তিনি চমৎকার ভঙ্গিমার গল্পের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। গল্পে বীণা, বীণার দাদার চরিত্র কেন্দ্র করে কাহিনী এগিয়ে গেছে। বীণার সঙ্গীত সাধনা গল্পের একটি প্রধান বিষয়। সঙ্গীতের মাধুর্য আর কথার মালা যেন সমস্ত গল্পের অবয়ব জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল, যা পাঠকের মন আর্দ্র করে তুলে। মন ভুলানো কথার যাদুতে ঘোষালের চমৎকার বুদ্ধির নৈপুণ্যে গল্পটি

Dhaka University Institutional Repository

সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। একই সাথে বীণাবাই এর চরিত্রের দৃঢ়তা, সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা ও দাদার প্রতি ভালোবাসা সব মিলিয়ে গল্পটি গতিশীলতা লাভ করেছে। কথার পর কথার ফুলঝুড়ি সাজিয়ে বীণার চরিত্র ও ঘোষালের রোমান্সকে অবলম্বন করলেও শেষ পযর্ন্ত তাকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে না নিয়ে গিয়ে রোমান্সের প্রতি চিরবিমুখ প্রমথ চৌধুরীর তাঁর প্রচলিত পথেই অগ্রসর হয়েছেন।

পুতুলের বিবাহবিভ্রাটঃ 'পুতুলের বিবাহবিভ্রাট' ঘোষালের বলা সত্য মিথ্যায় বানিয়ে, ঘোষালের ছাত্রের মায়ের খেয়ালীপনাকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক গল্প। ঘোষাল চমৎকার ভঙ্গিমায় কথার পরে কথা সাজিয়ে ছাত্রের মায়ের খেয়ালীপনার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা যেমন অভিনব তেমনি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। সমাজে নানা অসঙ্গতি বিদ্যমান আর এসব অসঙ্গতি, মানুষের মনের জটিলতা যে প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টিতে ধরা পড়ত তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আলোচ্য 'পুতুলের বিবাহ-বিভ্রাট' গল্পটি।

ঘোষালকে নিয়ে ইতিপূর্বে দুটি গল্পে দেখা গেছে কথার পিঠে ছন্দোবদ্ধ কথা সাজিয়ে সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণে গল্পবলায় কত ওস্তাদ। 'পুতুলের বিবাহবিভ্রাট' গল্পে ঘোষালের কল্পনাপ্রবণ মনের মিথ্যার নিগড়ে গড়ে ওঠা এক আজগুবি কাহিনী । ঘোষাল যে ছাত্রকে পড়াত এ গল্প সে ছাত্র ও তার খেয়ালী মাকে নিয়ে বর্ণিত। মানুষের মনের জটিলতা একটা পর্যায়ে এসে বিকারগ্রস্ততায় রূপ নেয় এ গল্পে তা বর্ণিত। ঘোষালের ছাত্রের মা তেমনি এক জটিল মানসিক সমস্যায় ভুগতেন। তিনি মনে করতেন ছেলে বিয়ে করার পর তাঁর অবাধ্য হয়ে গেছে, তিনি মনে করতেন ছেলে তাঁর বউমার হাতের পুতুল । আর এ কারণে বউকে জব্দ করার জন্য ছেলের কাছে আজগুবি সব বায়না ধরতেন, ছেলের কাছে তিনি বায়না ধরলেন পুত্রবধূর পুতুলের বিয়ে দেবেন। এই কারণে পুতুলের বিয়ের ব্যবস্থা করা হল এবং সামান্য কারণে সেই বিয়ে ভেঙ্গে দিলেন। একটি অপ্রাসঙ্গিক সামান্য বিষয় নিয়ে গল্পের কাহিনী গড়ে উঠলেও এখানে লেখক এক গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আজগুবি এ গল্পের অন্তরালে তীব্র নীতিবাক্য রয়েছে যা সুপ্ত বিবেকবোধকে জাগ্রত করে। "আমাদের সঙ্গে পুতুলের প্রভেদ কি ? আমরা রক্ত মাংসের পুতুল, আর ওরা মাটির কিংবা নেক্‌ড়ার পুতুল। এই তো?"[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১। প্রমথ চৌধুরী, গল্প সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১ম প্রকাশ, ১৩৪৮, কলিকাতা, ১৩৯৪, পৃঃ ৩২৮।

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩১।

৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০২।

৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৯।

৫। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের একশ'বছর, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ১৬৪।

৬। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রমথ চৌধুরী, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৪, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ১৬৯।

৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭০।

৮। প্রমথ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩০।

৯। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৪।

১০। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বীরবল ও বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যলোক, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ৩৬।

১১। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১।

১২। প্রমথ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭৯।

১৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭৯।

১৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯৮।

১৫। শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, ১৯৬২, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ২৬৯।

১৬। প্রমথ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের আঙ্গিক চেতনা

প্রমথ চৌধুরী গল্পের বিষয়ে যেমন গতানুগতিকতাকে পরিহার করেছেন তেমনি গল্পের ভাব-ভাষায় অর্থাৎ আঙ্গিকেও নিয়ে এসেছেন এক অভিনব কৌশল। তিনি কথ্যরীতিকে গল্পে ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত কথ্যরীতি তাঁর গল্পকে করেছে মার্জিত পরিশীলিত। গল্পের আঙ্গিক রচনায় তিনি তাঁর মনন, প্রজ্ঞা, মেধা, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি যে সাহিত্য রচনাকে সাধনা হিসেবে নিয়েছিলেন, এজন্য যে গভীর অনুশীলন করেছেন, প্রমথ চৌধুরীর গল্পের আঙ্গিক ভাষা বৈশিষ্ট্য নতুন করে সেই ইঙ্গিতই বহন করে। তিনি বহু যত্ন করে ভাষার ইমারত গড়ে তুলেছিলেন, যার ধারা বহুকাল প্রবহমান থেকে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, সচেতন পাঠক মাত্রই তা অনুধাবন করতে পারবেন। তিনি নতুন ভাষা, নতুন চিন্তা-চেতনা দিয়ে সাহিত্য জগতে তাঁর স্থানকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। নিরলস সাধনা দ্বারা যুক্তি, বুদ্ধি, মেধা ও আর্টের সমন্বয়ে বাংলা গল্পের আঙ্গিককে নতুনভাবে নতুনরূপে উপস্থাপন করে তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছেন। জীবনীশক্তির অনবদ্য বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয় তাঁর নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও প্রজ্ঞার দ্বারা অনুশীলিত ভাষাদর্শে, গল্পের অবয়ব নির্মাণ ও গঠনশৈলীতে। শিক্ষিত সমাজের জন্য অভিজাত রুচিশীল তীর্যক এক ভাষারীতি তিনি গড়ে তুলেছেন। তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে শিক্ষিত বিদগ্ধ মনের বহিঃপ্রকাশই বেশী চোখে পড়ে। বুদ্ধিদীপ্ত লেখনীর দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যে যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেন তাতে তিনি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রমথ চৌধুরী গল্প রচনা করেছেন ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ভাষার মারপ্যাঁচ দ্বারা তিনি সেই ব্যঙ্গ বক্রদৃষ্টিকে আরও বেশী উজ্জ্বল প্রাণবন্ত করেছেন। চরিত্রের বর্ণনায়, রূপ বর্ণনায়, প্রকৃতির রূপ চিত্রণ সব কিছুকেই তিনি এত নিখুঁত আর পরিপাট্য আবহ এনেছেন যে তাঁর গঠন-শৈলী সহজেই অন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর গল্পের বিষয় যেমন ছিল রুচিশীল মার্জিত অশ্লীলতামুক্ত তেমনি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি মার্জিত, অভিজাত, আর রুচিশীল মনের

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয় দিয়েছেন। ভাবালুতা, ভাবাবেগকে তিনি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পরিহার করেছেন। তাঁর শিল্পী মন একজন দক্ষ শিল্পীর তুলির আঁচরে বাংলা ভাষাকে জীবন্ত করে তুলেছে নতুন আঙ্গিকে, নতুন ঢঙে। তিনি অতিকথনের দ্বারা তাঁর রচনাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেননি। "মিতভাষিতা ও হীরককাঠিন্য বীরবলী গদ্যরীতি ও রচনারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ভারতে মিতভাষণের যে আদর ছিল তা বুঝা যায় এই থেকে যে, বৈয়াকরণ তাঁর সূত্রে একটি স্বরবর্ণ কমাতে পারলে পুত্রলাভের আনন্দ পেতেন। প্রমথ চৌধুরী মিতভাষণের এই ঐতিহ্যেকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। অল্প কথায় অনেক ভাবপ্রকাশের দুরূহ ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছিলেন। আমাদের অতিকথন ও অতিলেখনের দেশে তাঁর এই আত্মসংযম ও মিতভাষণ বিরল ব্যতিক্রম।"[১] বহুকাল তিনি গদ্য রচনার সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে তাঁর মেধার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। পরিহাসপ্রিয়তা, ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি, শ্লেষ, বিষম, বিরোধাভাস, জীবনদৃষ্টি, বুদ্ধি, প্রজ্ঞার প্রসাদগুণে তাঁর রচনা ছিল পরিপুর্ণ। এ প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন-"হীরা মালিনীর পরিচয় দিতে গিয়ে ভারতচন্দ্র বলেছিলেন, 'কথাতে হীরার ধার হীরা তার নাম।' প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতিতে আছে হীরককাঠিন্য, হীরার ধার ও ঝলক। বস্তুতঃ এটাই তাঁর অন্বিষ্ট, 'ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। শ্লেষ (পান্)বিষম (এমিগ্রাম) ও বিরোধাভাস (প্যারাডক্স) অলংকার ব্যবহারের দ্বারা প্রমথ চৌধুরী ভাষায় এনেছিলেন হীরার ধার আর ঝলক । দুঃখের কথা, অনেক সময়েই তা পর্যবসিত হয়েছে চাতুরী ও চটকে।"[২]

ভাষার সুন্দর মারপ্যাঁচ দিয়ে তৎসম শব্দ ব্যবহার করে চমৎকার উপমার মাধ্যমে, পরিহাস-মূলক উক্তি রচনাকে এত হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে কেবল প্রমথ চৌধুরীর পক্ষেই সম্ভব। এমন নমুনা তাঁর অনেক গল্পেই ফুটে উঠেছে-"আমি শত চেষ্টাতেও রিণীর মনকে আমার করায়াত্ত করতে পারি নি, তার জন্য আমি লজ্জিত নই- কেননা আকাশ-বাতাসকে কেউ আর মুঠোর ভিতরে চেপে ধরতে পারে না। তার মনের স্বভাবটা অনেকটা ঐ আকাশের মতোই ছিল, দিনে দিনে তার চেহারা বদলাত। আজ ঝড়-জল বজ্র-বিদ্যুৎ, কাল আবার চাঁদের আলো, বসন্তের হাওয়া। একদিন গোধূলি, আর- এক দিন কড়া রোদ্দুর। তা ছাড়া সে ছিল একাধারে শিশু বালিকা যুবতী আর বৃদ্ধা।

Dhaka University Institutional Repository

যখন তার স্ফূর্তি হত, তার আমোদ চড়ত, তখন সে ছোটো ছেলের মতো ব্যবহার করত ; আমার নাক ধরে টানত, চুল টানত, মুখ ভেংচাত, জিভ বার করে দেখাত।"[৩] (চার- ইয়ারি কথা)

প্রমথ চৌধুরী প্রকৃতির যে রূপ অঙ্কন করেছেন তাও অন্য লেখকদের থেকে ছিল সম্পূর্ণই আলাদা। নির্জন নিস্তব্দ প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে তিনি প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। এসব প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি যে শব্দ, ভাষার চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন তা সহজেই সকলের দৃষ্টি কাড়ে। আহুতি হচ্ছে তেমনি এক গল্প যেখানে প্রকৃতির এক অভিনব বর্ণনা রয়েছে, যা থেকে তার ভাষা ব্যবহার অলংকার প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। "আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, গ্রামে আগুন লাগলে যে রকম হয়, আকাশের চেহারা সেই রকম হয়েছে, অথচ আগুন লাগবার অপর লক্ষণ- আকাশ- জোড়া হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ শুনতে পেলুম না। চারি দিক এমন নির্জন, এমন নিস্তব্দ যে, মনে হল, মৃত্যুর অটল শান্তি যেন বিশ্বচরাচরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার পর পাল্কি আর- একটু অগ্রসর হলে দেখলুম যে, সমুখে যা পড়ে আছে তা একটি- মরুভূমি বালির নয়, পোড়ামাটির পাহাড়, সে মাটি পাতখোলার মতো, তার গায়ে একটি তৃণ পর্যন্ত নেই। এই পোড়া-মাটির উপরে মানুষের এখন বসবাস নেই, কিন্তু পূর্বে যে ছিল তার অসংখ্য এবং অপর্যাপ্ত চিহ্ন চারি দিকে ছড়ানো রয়েছে। এ যেন ইটের রাজ্য। যতদুর চোখ যায়, দেখি শুধু ইট আর ইট, কোথায়ওবা তা গাদা হয়ে রয়েছে ; কোথায়ওবা তা হাজারে হাজারে মাটির উপর বেছানো রয়েছে, আর সে ইট এত লাল যে, দেখতে মনে হয়, টাটকা রক্ত যেন চাপ বেঁধে গেছে;এ ভূতলশায়ী জনপদের ভিতর থেকে যা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, সে হচ্ছে গাছ । কিন্তু তার একটিতেও পাতা নেই, সব নেড়া, সব শুকনো, সব মরা। দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, কোথায়ওবা এই গাছের কঙ্কালগুলি কোথায়ওবা দু-একটি একধারে আলগোছ হয়ে রয়েছে। আর এই ইট কাঠ মাটি আকাশের সর্বাঙ্গে যেন রক্তবর্ণ আগুন জড়িয়ে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে বেহারাদের প্রকৃতির লোকের ভয় পাওয়াটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা আমারই গা ছম্ ছম্ করতে লাগল।"[৪] (আহুতি)

প্রচুর জ্ঞান আহরণের প্রেক্ষিতে প্রমথ চৌধুরীর হাতে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে তাতে পরিপক্বতার ছাপ স্পষ্ট। নিজের চিন্তা-চেতনা আর গভীর প্রজ্ঞায় তিনি যা যথার্থ উপযুক্ত আর

Dhaka University Institutional Repository

যুগোপযোগী বলে মনে করেছেন তাকেই সাহিত্য রচনার বাহন করেছেন। তিনি ফরাসি সাহিত্য পাঠ করেছেন আর তাঁর রচনায় ফরাসি সাহিত্যের ছাপ রয়েছে, ফরাসি সাহিত্যের মত তিনি তাঁর গল্পের আঙ্গিক রচনা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি পাঠকের আবেগ, পছন্দের কথা চিন্তা না করেই তাঁর প্রচলিত পথে এগিয়েছেন দ্বিধাহীন চিত্তে, যদিও সচেতন পাঠক মাত্রই তাঁর রচনা থেকে নতুন কিছু পেয়ে ভিন্ন মাত্রার আনন্দ উপভোগ করেছেন। ইংরেজী গদ্যরীতি অপেক্ষা তিনি ফরাসি গদ্য রীতিকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। উগো, ফ্লোবোর, মোপাসাঁ, দোদে প্রমুখ ফরাসি সাহিত্যিক তাঁর চেতনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফরাসি লেখকদের অনুসৃত মত লেখার ষ্টাইল তাঁকে আকৃষ্ট করত। যার ফলে তাঁদের ব্যবহৃত রীতিতেই তিনি সাহিত্যে রচনা করেন। আর এ কারণে তিনি সমসাময়িক লেখকদের থেকে আলাদা ছিলেন। তিনি ফরাসি সাহিত্য পড়ে গভীর-ভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন, যার ফলে তিনি একই রীতি তাঁর সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। তাঁর রচনা পড়ে বোঝা যায় দুঃখের একটি বিষয়কেও তিনি বিষাদের ছায়া দিয়ে ভারাক্রান্ত না করে তার মধ্যে এমন আঙ্গিক এনেছেন যে দুঃখের বিষয়কে পরিহাসের মাধ্যমে লঘু চালে কঠিন দুঃখ কষ্টকে ভিন্ন পথে চালিত করেছেন। অসীম প্রতিভার অধিকারী বীরবল আঙ্গিক চেতনায় নিয়ে এসেছেন মার্জিত ভাষা, পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট স্বচ্ছ এক আবহ।

সংযত ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে রচনাকে উঁচু স্তরে স্থান করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন "প্রমথ চৌধুরী চেয়েছিলেন আমরা ফরাসি গদ্যের অনুশীলন করি। সাহিত্যে আনাড়িপনা, বাক্যরচনায় ঢিলেমি, শব্দপ্রয়োগে শৈথিল্য তিনি সহ্য করতে চাননি। তিনি বাঙালি লেখককে ইংরেজী গদ্যরীতি বর্জন ও ফরাসি গদ্যরীতি গ্রহণের উপদেশ দিয়েছিলেন।"[৫] এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর নিজের অভিমত হল "সংগিতের মতো সাহিত্যও যে একটি আর্ট, এবং যত্ন ও অভ্যাস ব্যতীত এ আর্ট যে আয়ত্ত করা যায় না, এ সত্য আমরা উপেক্ষা করতে শিখেছি। ইংরেজী গদ্যের কুদৃষ্টান্তই এর একমাত্র কারণ।... ইংরেজী সাহিত্যের এই amateurishness আমরা সাদরে অবলম্বন করেছি, কেননা যেমন তেমন করে যা-হোক- একটা- কিছু লিখে ফেলার ভিতর কোনোরূপ আয়াস নেই, কোনোরূপ আত্মসংযম নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ফরাসি সাহিত্যের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দুইই লেখকদের সংযম অভ্যাস করতে শিক্ষা দেয়।"[৬] (ফরাসি সাহিত্যের বর্ণ পরিচয়)

আঙ্গিক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর বীরবল নামটি গ্রহণের পিছনে যৌক্তিক কারণ খুঁজে দেখা প্রয়োজন। সম্রাট আকবরের সেনাপতি ও সভাকবি ছিলেন রাজা বীরবল। ইতিহাসে একজন বিচক্ষণ, রসিক ও বিদুষক হিসেবে তাঁর নাম উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত হয়ে আছে। তিনি ছিলেন কবি, গায়ক, গল্প রচয়িতা ও সুরসিক। বীরবলের বাকচাতুর্যময় ক্ষুরধার জবাব নিয়ে বহু কাহিনী রচিত হয়েছে এবং বিদগ্ধ রসিকজনের কাছে বীরবলের জনপ্রিয়তা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আর তাঁর চরিত্রের এই বাকপটুতা ব্যঙ্গপ্রিয়তা এবং রসিকতার পরিচয় প্রমথ চৌধুরী যখন পেয়েছিলেন তখন থেকেই তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন। বীরবলের নামটি তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল, বীরবলের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল। তিনি বীরবলকে অনুসরণ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। সমাজের অন্তঃস্বারশূন্যতা নিয়ে সব সময় রসিকতাচ্ছলে ব্যঙ্গ করে ঘুমন্ত জাতিকে জাগাতে চেয়েছেন।

একই কারণে দেখা যায় ভারতচন্দ্রের সরস সুন্দর লেখাকে তিনি পছন্দ করতেন এবং প্রশংসা করতেন। বীরবলের বুদ্ধিমত্তা বাকচাতুর্য ও তর্ক প্রবণতায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি বীরবল নামটি গ্রহণ করেছেন এবং সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন "হাসিমুখে অনেক কথা বলা যায়, যা গম্ভীরভাবে বল্‌লে লোকের সহ্য হয় না। আর তাছাড়া আমার এ ধারণাও জন্মে যে, অনেক ক্ষেত্রে তর্ক করা বৃথা, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার মজুরি পোষায় না। এ কারণে আমি ... সাহিত্যের আসরে নামলুম, বীরবল সেজে।"[৭] তিনি তার সাহিত্যে বীরবলের চরিত্রের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। একই রকম রঙ্গরস, তর্ক-বিতর্ক, বুদ্ধিমত্তা, বাকচাতুর্য প্রয়োগ করে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বীরবল নাম গ্রহণের সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

ভূদেব চৌধুরী প্রমথ চৌধুরীর ভাষা আর আঙ্গিক চেতনার আলোচনায় তার শিল্পী মনকেই প্রধান্য দিয়েছেন বেশী । "তাঁর সব গল্পই প্রাণবন্ত- নিরপেক্ষ চকিত দেহসৌন্দর্য্যের এক বিদগ্ধতা-

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণ লাবণ্য বিচ্ছুরিত করে থাকে, তাতেই এই গল্প সমষ্টির গায়ে লেগেছে মননশীল অভিজাত্যের দ্যুতি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়, গল্পের দ্যুতিময় আঙ্গিক- পরিকল্পনার প্রতি শিল্পীর অবধান সমধিক হলেও প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্টিতে জীবন বিষয়ের অপ্রাচুর্য ছিলনা কখনো, গল্পের schematic beauty তাঁর চিত্তের মুখ্য আকর্ষণ হলেও them এর প্রাণময় দাবিকেও তিনি অস্বীকার করেননি। বরং তাঁর অপার- বিস্তৃত বিচিত্র জীবন- পরিচয়ের পুঞ্জিত সম্পদকেই সহৃদয় মনের সচেতন অবধানে ভরা পরিপাটি কলাকৌশলের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন। তা সত্ত্বে, জীবনীশক্তির প্রচুরতাকে বুদ্ধিদীপ্ত বিন্যাসের অন্তরালে আড়াল করে রাখার Intellectual লুকোচুরি খেলাই প্রমথ চৌধুরীর সার্থক 'সাহিত্য খেলা'। পরবর্তী কালের স্বভাবত- মননশীল কিছু কিছু শিল্পী এই বুদ্ধি- প্রধান রূপ- বিন্যাসের খেলার সচেতনভাবে আত্মনিয়োগ করে খ্যাতিমান হয়েছেন। বলাবাহুল্য এঁদের প্রায় সকলেই চৌধুরী মশায়ের মননোজ্জ্বল দুর্লভ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে সমৃদ্ধ- চেতন হয়েছিলেন।"[৮]

প্রমথ চৌধুরীর বাংলা সাহিত্যে বিচরণ করে এমন এক আন্দোলন ঘটিয়েছিলেন যা সমসাময়িক সব কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনিই প্রথম মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারা প্রবর্তন করে মৌখিক ভাষাকে পুস্তকের ভাষা রূপে প্রয়োগ করে তিনি রীতিমত বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন এবং জয়ের মালা গলায় ধারণ করেই বিদায় নিয়েছিলেন। গদ্য রচনার প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে তিনি ভেঙ্গে দিয়েছেন। তবে প্রমথ চৌধুরী মৌখিক ভাষা ব্যবহার করলেও তা ছিল মার্জিত ভাষা। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত "আমরা মৌখিক ভাষা ব্যবহার করতে চাই ; সুতরাং যা ভদ্রলোকের মুখে চলে না, এমন কোনও শব্দ সাহিত্যে স্থান দেবার পক্ষপাতী আমরা কখনই হতে পারি না। slang ভাষা নয় ; হয় তা অপভাষা, নয় উপভাষা। ও বস্তু হচ্ছে একদিকে মৌখিক ভাষার বিকার, আর একদিকে বিদ্যার কারখানায় সাঁটে কথা।... আমরা বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ অর্থাৎ খাঁটিভাবে ব্যবহার করতে চাই। ভাষার শুদ্ধতা কাকে বলে তা... বাগ্‌ভট্টালঙ্কারের একটি বচনে বেশ স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। অপভ্রংশস্তু যচ্ছুদ্ধং তত্তদ্দেশেষু ভষিতম্। অর্থাৎ সেই দেশে কথিতভাষা সেই সেই দেশের বিশুদ্ধ অপভ্রংশ।"[৯]

Dhaka University Institutional Repository

সেই সময় অধিকাংশ রচনাই সাধুভাষায় রচিত হত। সংস্কৃত শব্দের ব্যাপক ব্যবহার ছিল তৎকালীন রচনার প্রধান গুণ।

হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে ভিন্ন ব্যঞ্জনায়, স্বতন্ত্র উপস্থাপনায় প্রমথ চৌধুরী গল্পের যে আঙ্গিক গড়ে তুলেছেন তা একান্তই তাঁর নিজের উদ্ভাবিত রীতি- অন্য কোন রীতি তিনি গ্রহণ করেননি তারপরও তাঁর প্রচলিত ঢং কিংবা উপস্থাপনা অন্য কারও লেখার দেখা যায়নি। অর্থাৎ তিনি সত্যিকার অর্থে ভাবকে পরিহার করে গল্পের যে আঙ্গিক গড়েছেন তা ছিল অকৃত্রিম, তাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। "স্বাতন্ত্র্য স্টাইলের মূলধর্ম সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্য কৃত্রিম বা মিথ্যা হলে তা চলে না, খাঁটি হওয়া চাই। যদি কোনো ধার-করা স্বাতন্ত্র্যের আশ্রয় নেওয়া হয়, তবে স্টাইলের মধ্যেও কৃত্রিমতা দেখা দেয়। আসলে খাঁটি সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য শুধু সাধনা সাপেক্ষ নয়, প্রকৃতিদত্তও বটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যথার্থ সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য বোঝার উপায় কি ? এর উত্তরে বলা যায়। যদি কোনো সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্যকে স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, তবেই তাকে খাঁটি বলে গ্রহণ করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে পাঠককে তাঁর বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করতে হবে।"[১০]

গল্পে বর্ণিত প্রকৃতি চিত্র, রূপবর্ণনা, যৌবনধর্ম সর্বোপরি ভাবাবেগবর্জিত এক অকৃত্রিম অনুসঙ্গ সব মিলিয়ে বীরবলের আঙ্গিক একান্তই নিজস্ব। তিনি খুব সহজেই একটা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারতেন, কারণ তিনি জানতে রচনার আঙ্গিক হৃদয়াগ্রাহী আকর্ষক না হলে পাঠকের সাথে লেখকের একটা ফাঁক থেকেই যাবে। "প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রধান আকর্ষণ তাঁর স্টাইল। তাঁর লেখা পড়লেই মনে হয়, সেখানে আর কিছু না থাক, মৌলিকতা আছে। তাঁর যেমন নতুন কিছু বলবার আছে, তেমনি নতুন ঢঙে বলবার চেষ্টাও আছে। তাঁর প্রতিভাকে আলৌকিক বলতে পারিনে বটে, কিন্তু অনায়াসে অনন্যসাধারণ বলতে পারি। এই স্বাতন্ত্র্যই প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রধান সৌন্দর্য এবং তাঁর সাহিত্যিক মার্যাদার ভিত্তি।"[১১] এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত "সমাজে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা সামাজিক লোকের মতে দোষ হিসেবে গণ্য হতে পারে, কিন্তু মনোজগতে বাঁচতে হলে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করতেই হয়। আমরা কাব্যই লিখি আর অলঙ্কারই লিখি তার ভিতর

Dhaka University Institutional Repository

কোনোই মূল্য থাকে না যদি একটি ব্যক্তিবিশেষের মনের পরিচায়ক না হয়। এই মনের বিশেষত্ব যদি এক পয়সাও হয়, তার দাম ষোল আনা।... আমার প্রথম লেখার ভিতরে যে গুণ অথবা দোষ ছিল, আমার আজকের লেখার ভিতরেও সেই গুণ অথবা দোষ আছে আর সে বস্তুর নাম হচ্ছে Individuality।"[১২]

প্রমথ চৌধুরীর রচনায় আঙ্গিকের অন্যতম দিক হল স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্য তাকে এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী করেছে, তাঁর চিন্তার জগৎক প্রসারিত করেছে। এক অভাবনীয় প্রজ্ঞা দিয়ে গতানুগতিকতাকে পরিহার করে ভাব ভাষা ছন্দ যুক্তি বুদ্ধির মারপ্যাঁচে তিনি যে আঙ্গিক এনেছেন তা প্রতিটি গল্পকে স্বতন্ত্র করেছে। চিন্তাশক্তির গভীর ছাপ তাঁর আঙ্গিক চেতনার লক্ষণীয় বিষয়। নিজের চিন্তা, নিজের প্রকাশ ক্ষমতা, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই তিনি তাঁর সাহিত্যের আঙ্গিক গড়ে তুলেছেন। এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা দিয়ে সকলের মত ও পথকে পরিহার করে কৃষ্ণনগরে বড় হয়ে উঠা বীরবল বিচিত্র সব বিষয়ের অবলম্বনে শব্দগঠন, ছন্দ, অবয়ব সব কিছুতেই স্বাতন্ত্র্য এনেছেন। সর্বোপরি চিন্তাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন প্রচুর পড়েছেন, প্রচুর জেনেছেন অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ করে গল্প লেখায় হাত দিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব পথে প্রকৃতির যে রূপ বর্ণনা করেছেন তার সাথে অন্য কোন লেখকের বর্ণনার কোন মিল নেই।

"শ্রাবণ মাস, অমাবস্যার রাত্তির, তার উপর আবার তেমনি দুর্যোগ। চারদিক একবারে অন্ধকারে ঠাসা। আকাশে যেন দেবতারা আবলুস কাঠের কপাট ভেজিয়ে দিয়েছে; আর তার ভিতর দিয়ে যা গলে পড়ছে তা জল নয়- একদম আলকতারা। আর তার এক-এক ফোঁটা কি মোটা, যেন তামাকের গুল।"[১৩] (ফরমায়েশি গল্প)

"সে- সব গলিতে যেন অন্ধকারের বান ঢেকেছে। রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলোর জানালা সব জেলের ফটকের মতো কষে বন্ধ। চার পাশে সব নির্জন, সব নীরব, নিঝুম, যেন সমগ্র সুরাট শহরটা রাত্তিরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মধ্যে মধ্যে দু- একটা বাড়ির গবাক্ষ দিয়ে আলো দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যাচ্ছে। কিন্তু যেখানেই আলো, সেখানেই কান্নার সুর। সুরাটে তখন খুব প্লেগ হচ্ছিল।"[১৪] (নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা)

প্রকৃতি এরূপ অভিনব চমকপ্রদ বর্ণনা এর আগে অন্য কোন লেখকের লেখায় দেখা যায়নি। ভাষা প্রয়োগে যে চমৎকারিত্ব প্রকাশিত হয়েছে তা সহজেই প্রমথ চৌধুরীকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে। প্রকৃতির রূপচিত্রণে তাঁর নির্মিত স্বতন্ত্র আঙ্গিক সহজেই পাঠকের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছে।

নারীরূপ বর্ণনায়ও প্রমথ চৌধুরী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখে পরিপাট্য আঙ্গিক গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। "চমৎকার, দেখতে একেবারে নীলপাথরের ভেনাস।"[১৫] নারীর রূপ বর্ণনার এমন স্বতন্ত্র উৎকৃষ্ট বর্ণনা আর পাওয়া যায়নি। এ ধরণের বহু উদাহরণ তাঁর অন্যান্য গল্পে পরিলক্ষিত হয়। নারীরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যে সব উপমা, ভাষা, শব্দ ব্যবহার করেছেন তা তাঁর গল্পের আঙ্গিককে দিয়েছে এক নতুন ব্যঞ্জনা।

"সেই গ্রীসিয়ান নাক, সেই ভায়োলেট চোখ। আর ঠোঁট- চাপা হাসি, যার ভিতর আছে শুধু যাদু।"[১৬] (মেরি ক্রিসমাস)

"সে ছিল বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তাই তাকে ছুতে ভয় করতুম। বিদ্যুৎকে পোষ মানাবার বিদ্যে আমি জানতুম না।"[১৭] (সহযাত্রী)

প্রমথ চৌধুরী অত্যন্ত নিপুণতার সাথে শিল্পীর কারুকাজে খচিত করে গল্পের আঙ্গিক, গঠন-শৈলী নির্মাণ করেছেন- তাতে বলার ভঙ্গি ভিন্ন, রূপ প্রকৃতি সবকিছুতে নিজস্ব স্টাইল ফুটে উঠেছে। তিনি ভাষার গঠন সম্পর্কে বলেছেন "আমাদের রচনায় পদ, বাক্য কিছুই সুবিন্যস্ত নয়। ইহা যে শক্তিহীনতার লক্ষণ তা বলা বাহুল্য। যে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয়, সে- দেহের শক্তিও নাই, সৌন্দর্যও নাই। প্রতি জীবন্ত ভাষারই একটি নিজস্ব গঠন আছে। সেই গঠন রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের গদ্য স্বচ্ছন্দ হয় না।"[১৮] অন্যত্র তিনি বলেছেন "লেখক মাত্রেরই একটি বিশেষ ধরণ আছে, সেই নিজস্ব ধরণে রচনা করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক এবং

Dhaka University Institutional Repository

কর্তব্য। পরের ঢঙের নকল করা শুধু সং। যা লিখতে আমি আনন্দ লাভ করিনে, তা পড়তে যে পাঠক আনন্দ লাভ করবেন, যে লেখার আমার শিক্ষা নেই, সেই লেখায় যে পাঠকের শিক্ষা হবে, এত বড় মিথ্যা কথাতে আমি বিশ্বাস করিনে। আমার দেহমনের ভঙ্গিটি আমার চিরসঙ্গী, সেটিকে ত্যাগ করা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হবে না। সমালোচকের তাড়নায় লেখার ভঙ্গিটি ছাড়ার চাইতে লেখা ছাড়া ঢের সহজ, অথচ সমালোচকদের মনোরঞ্জন করতে হলে হয়ত আমার লেখার ঢং বদলাতে হবে।"[১৯] তাঁর এসব উক্তি থেকে বুঝা যায় তিনি তাঁর নিজের মত ও পথে কতটা অবিচল ছিলেন। সমালোচকদের ভয়ে তিনি কখনও তাঁর নিজস্ব স্টাইল বিসর্জন দেননি। আবেগের গতানুগতিক পথে গা না ভাসিয়ে কল্পনাকে তিনি তীক্ষ্ণ পান্ডিত্য, বাক্যের সুষমায় আর শব্দের চাতুর্যে অভিনবত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। 'চার-ইয়ারি কথা' গল্পের আঙ্গিকে তাঁর শিল্পী মনের পরিচয় সুস্পষ্ট।

"ঝড়বৃষ্টি আসবার আশু সম্ভাবনা আছে কি না তাই দেখবার জন্য আমরা চারজনেই বারান্দায় গেলুম। গিয়ে আকাশের যে চেহারা দেখলুম তাতে আমার বুক চেপে ধরলে, গায়ে কাঁটা দিলে। এদেশের মেঘলা দিনে এবং মেঘলা রাত্তিরের চেহারা আমরা সবাই চিনি; কিন্তু এ যেন আর-এক পৃথিবীর আর-এক আকাশ- দিনের কি রাত্তিরের বলা শক্ত। মাথার উপরে কিংবা সমুখে কোথাও ঘনঘটা করে নেই; আশে-পাশে কোথায়ও মেঘের চাপ নেই; মনে হল যেন কে সমস্ত আকাশটিকে একখানি একরঙা মেঘের ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছে এবং সে রং কালোও নয়, ঘনও নয়; কেননা তার ভিতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। ছাই-রঙের কাঁচের ঢাকনির ভিতর থেকে যেরকম আলো দেখা যায়, সেই রকম আলো আকাশে জোড়া এমন মলিন, এমন মরা আলো আমি জীবনে কখনো দেখি নি।... মড়ার মুখে হাসি দেখলে মানুষের মনে যেরকম কৌতূহলমিশ্রিত আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সে রাত্তিরের দৃশ্য দেখে আমার মনে ঠিক সেইরকম কৌতূহল ও আতঙ্ক, দুই এক সঙ্গে সমান উদয় হয়েছিল।"[২০] (চার-ইয়ারি কথা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যালোচনায় বলেছেন-"এ যেন কল্পনার কড়া আগুনে গালাই- করা ঢালাই- করা ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের মূর্তি। এর গঠন যেমন শিল্পোচিত, তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষোচিত। গদ্যশিল্পের এমন উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে খুবই দুর্লভ।"[২১] অন্যত্র তিনি বলেছেন- "তোমার কবিতায় যে গুণ তোমার গদ্যেও তাই দেখি- কোথাও ফাঁক নেই এবং শৈথিল্য নেই, একবারে ঠাসবুনানি। এ গুণটি কিন্তু প্রাচ্য নয়। আমাদের বেশে ভূষায় বাক্যে এবং চিন্তাতেও অনেকটা বাহুল্য থাকে গরম দেশে অত্যন্ত নিরেটভাবে মনঃসংযোগ করাটা দুঃখকর। কেননা এখানে কাজের তুলনায় অবকাশটা একটু প্রচুর না হলে আমরা বাঁচিনে। অতএব যখন সময়ের টানাটানি নেই তখন ভাব ও বাক্য সমাবেশের ঠাসাঠাসিটা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। ওতে লেখকেরও সংযমের দরকার করে, পাঠকেরও তাই তাড়া থাকলে সেটা করা যায় কিন্তু যেখানে তাগিদ নেই সেখানে গয়ংগচ্ছ চালটাই মানুষ স্বভাবত পছন্দ করে। এই সকল কারণেই, তোমার গদ্য রচনারীতির মধ্যে যে নৈপুণ্য আছে আমাদের দেশের পাঠকেরা তার পুরো দাম দিতে প্রস্তুত নন। গদ্য লেখাও যে একটা রচনা সেটা আমরা এখনো স্বীকার করতে শিখি নি।"[২২]

সহজ সরল পথে প্রমথ চৌধুরী কখনও আগাননি। সোজাভাবে কোন কথা না বলে তিনি বাঁকা ভাষার কথা বলেছেন। "বাংলার নব সভ্যতাকে বিদ্রূপ করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী এখানে পেঁচালো ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন এবং তাতে তাঁর উদ্দেশ্য সার্থকতরভাবে সাধিত হয়েছে। বস্তুত; তাঁর সাহিত্যে পূর্বাপর অসংলগ্ন ভাবের ও অপ্রত্যাশিত একত্র সমাবেশ, ভাষার দ্ব্যর্থবোধকতা, আপাত-বিরোধী বর্ণনা, পরস্পরসংলগ্ন একাধিক বাক্যের ইতি ও নেতিবাচকতা, হালকা চালের মধ্য দিয়ে গভীরভাবের পরিবেশন, অল্প কথার অনেক কিছু বলার চেষ্টা, শব্দ নিয়ে লোফালুফি ইত্যাদি খুবই লক্ষ্য করা যায়।"[২৩] আর তাঁর নিজের ভাষা "আমার কলমের মুখে অক্ষরগুলো সহজেই একটু বাঁকা হয়ে বেরোয়। আমি সেগুলো সিধে করতে চেষ্টা না করে যেদিকে তাদের সহজ গতি সেই দিকেই ঝোঁক দিই।"[২৪]

সার্বিকভাবে বলা যায় প্রমথ চৌধুরী ছিলেন শিল্পী মনের অধিকারী, নিপুণ কারিগর- ফলে এই কৃষ্ণনগরের নাগরিক মনন শিল্পীর হাত থেকে যে শিল্পমহিমা বেরিয়ে এসেছে ছন্দে, অলঙ্কারে, নৈপুণ্যে সবদিক থেকেই তা অনন্যসাধারণ। তিনি ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়। আর সঙ্গীতের ধ্বনি প্রবাহ-মানতা যেন তাঁর গল্পের গঠনশৈলীকে আবিষ্ট করেছিল। ধ্বনির সঙ্গে ছন্দ, ছন্দের সঙ্গে বাকচাতুর্য

Dhaka University Institutional Repository

সব মিলিয়ে তাঁর গল্পের আঙ্গিক সব দিক থেকেই ভিন্ন। তাঁর যুক্তিবাদী পরিচ্ছন্ন মন বাঙালী ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল তার সার্থক সুষমা নিয়েই গল্পের আঙ্গিক গড়ে উঠেছে।

অলঙ্কার ব্যবহারেও তিনি ছিলেন নিপুণ শিল্পী। হাস্যরসিক প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বহু ক্ষেত্রেই অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। তেমনি কিছু গল্পের অংশ এখানে দেয়া হল।

"গল্প লেখার অধিকার আমার আছে কিনা জানি নে কিন্তু না লেখবার অধিকার আমার নেই।"[২৫] (গল্প লেখা)

"এক কথায় মানুষের জীবনে যা হয় তার নাম প্রাণান্ত।"[২৬] (ফরমায়েশী গল্প)

"একে তরণ বয়েস, তাতে আবার হাতের গোড়ায় পড়ে- পাওয়া ডানাকাটা পরি ! তার উপর আবার এই দুর্যোগের সুযোগ ! এ অবস্থায় পঞ্চতপা ঋষিদেরই মাথার ঠিক থাকে না- ব্রাহ্মণের ছেলে তো মাত্র বালাযোগী। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল; ব্রাহ্মণ যুবক সিধেভাবে, আর যুবতীটি আড়ভাবে। চারক্ষুর মিলন হবামাত্র সেই সুন্দরীর নয়নকোণ থেকে একটি উল্কাকণা খসে এসে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের ভিতর দিয়ে তার মরমে গিয়ে প্রবেশ করলে। ব্রাহ্মণের ছেলের বুক বিলেতি বেদান্ত পড়ে শুকিয়ে একেবারে শোলার মতো চিমসে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল, কাজেই সেই সুন্দরীর চোখের চকমকি-ঠোকা আগুনের ফুলকিটি সেখানে পড়বা-মাত্র সে বুকে আগুন জ্বলে উঠল। আর তার ফলে, তার বুকের ভিতর যে ধাতু ছিল সেসব গলে একাকার হয়ে উথলে উঠতে লাগল, আর অমনি তার অন্তরে ভূমিকম্প হতে শুরু হল।"[২৭] (ফরমায়েশী গল্প)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বীরবল ও বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যলোক, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ৬৬।

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬।

৩। প্রমথ চৌধুরী, গল্প সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১ম সংস্করণ, ১৩৪৮, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃঃ ৫৭।

৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯২।

৫। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭২।

৬। প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ , বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১ম প্রকাশ, ১৯৫২, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ ১২৩।

৭। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রমথ চৌধুরী, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৪, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ৬৮।

৮। শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, ১৯৬২, কলিকাত, ১৯৯৯, পৃঃ ২৭৩।

৯। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২।

১০। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৩।

১১। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪।

১২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৫।

১৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৮।

১৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৪।

১৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৩।

১৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০৬।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

১৮। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৯।

১৯। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮।

২০। প্রমথ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯।

২১। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৩।

২২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৩।

২৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩২।

২৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩২।

২৫। প্রমথ চৌধুরী , পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩০।

২৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৮।

২৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

প্রমথ চৌধুরীর রূপ চেতনা

যুক্তি বুদ্ধির সূক্ষ্ম বিচার আর জ্ঞানের প্রখরতায় যিনি ছিলেন সংশ্লিষ্ট, রূপ কখনও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কৃষ্ণনগরে বেড়ে উঠা প্রমথ চৌধুরী কুমোরদের মূর্তি গড়ার কৌশল দেখতেন তন্ময় হয়ে, আর কৃষ্ণনগরে মূর্তি গড়ার নিপুণ আর্ট আর অনুপম সৌন্দর্য তাঁর হৃদয়ে স্থায়ী রূপ নিয়েছিল। তাঁর সৌন্দর্যপিপাসু মন এখান থেকেই সুন্দরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। পারিবারিক আবহও এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরিবারের পুরুষরা যেমন ছিলেন সুপুরুষ, তেমনি নারীরাও ছিলেন অপরূপ রূপের অধিকারী। এরপর সারাজীবন তিনি রূপে মুগ্ধ হয়েছেন, রূপের প্রশংসা করেছেন। তবে প্রমথ চৌধুরীর বৈশিষ্ট্য গতানুগতিকতাকে পরিহার, রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি প্রচলিত পথ ও মতকে পরিহার করে এক অভিনব সৌন্দর্য্যের দিকে অগ্রসর হয়ে সুনিপুণ তুলির স্পর্শে অনুপম ছবি অঙ্কন করেছেন। তাঁর গল্পের প্রতিটি পরতে পরতে সেই ছবি ফুটে উঠেছে। এই রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ প্রকৃতি কেউই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি, প্রেমের এক অপার সুন্দর রূপ তিনি এঁকেছেন। তিনি চিরকালই ছিলেন রূপের ভক্ত। এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব দর্শন হল-"আমাদের কাছে রূপের পরিচয় রূপিয়া দিয়ে আমরা ছবি চিনি নে, তবুও কিনি নাম দেখে এবং দাম দেখে। ইউরোপে যারা শিব গড়তে বাঁদর গড়ে, তাদেরই হস্তরচিত বিগ্রহ আমরা সংগহ করে সুখী না হই, খুশি থাকি।"[১] প্রমথ চৌধুরীর অনুসন্ধানী চোখ সব সময় প্রখর ছিল, ফলে তিনি যে সৌন্দর্যের অন্বেষণ করেছেন, তা ছিল নির্ভেজাল, অকৃত্রিম, খাঁটি।

সাহিত্য সাধনার একেবারে আদিস্তর থেকে দেখা গেছে রূপের সাথে অশ্লীলতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ রূপকে বিকৃতরূপে অঙ্কন করার প্রবণতা দেখা গেছে অনেক কবি লেখকদের মধ্যে। প্রমথ চৌধুরী সৌন্দর্যকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অঙ্কন করলেন, সৌন্দর্য্যের সাথে অশ্লীলতার সম্মিলনে ছিল তার প্রবল আপত্তি। তিনি ছিলেন যৌবনের পূজারী, তাঁর গল্পে বর্ণিত রূপ সৌন্দর্যবোধ কখনও অশ্লীলতাকে, স্থূলতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। বরং প্রতিটি রূপের বর্ণনা এত নিখুঁত

Dhaka University Institutional Repository

মার্জিত, সংযত আর পবিত্র যে তাতে দেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের পূজারী ছিলেন তিনি চিরকাল। প্রাচীন, গ্রীস, ইতালী, ভারত বর্তমান ইউরোপ, চীন, জাপান সর্বত্রই এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের আদর ছিল ও আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে যে রূপের বর্ণনা আছে সে সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত "আমরা যাকে সংস্কৃত কাব্য বলি, তাতে রূপবর্ণনা ছাড়া আর বড় কিছু নেই; আর সে রূপবর্ণনাও আসলে দেহের, বিশেষতঃ রমণী দেহের বর্ণনা; কেননা সে কাব্য-সাহিত্যে যে প্রকৃতির বর্ণনা আছে তাও বস্তুতঃ রমণীর রূপবর্ণনা। প্রকৃতিকে তাঁহারা সুন্দরী রমণী হিসেবেই দেখেছিলেন।"[২] ফলে সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত নারীরূপ তাঁকে আকৃষ্ট করেনি, আর তাই তিনি তাঁদের পথ অনুসরণ না করে নিজস্ব পথে অগ্রসর হয়ে সার্থক হয়েছেন।

প্রমথ চৌধুরী জ্ঞানের যেমন অনুসারী ছিলেন তেমনি রূপেরও অনুরাগী ছিলেন। কৃষ্ণনগরে বসবাসকালে কৃষ্ণনাগরিকদের মূর্তি গড়ার কৌশল, মূর্তির সূক্ষ্ম সুন্দর কারুকাজ তাঁর মনে সুন্দরের প্রতি এক প্রবল আকাঙ্খার জন্ম দিয়েছিল। তিনি ছিলেন রূপের পূজারী, রূপ তাঁকে মুগ্ধ করত বলেই তিনি রূপের বর্ণনার আনন্দ পেতেন। তিনি ইন্দ্রিয়জ রূপকে সবসময় প্রাধান্য দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে নিজের অভিমত "ইন্দ্রিয়জ বলে বাইরের রূপের দিকে পিঠ ফেরালে ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন ; কেননা ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড় ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধনসূত্র। এবং ঐ সূত্রেই রূপের জন্ম।"[৩] সৌন্দর্যবোধ মানুষকে মনের দিক থেকে অনেক বেশী উদার করে। প্রমথ চৌধুরী দেশী-বিদেশী, নিম্ন শ্রেণী উচ্চ শ্রেণী সকল প্রকার নারীরূপের বর্ণনা দিয়েছেন। এর মধ্যে দাসী, ভূত, বাইজী, কেউই বাদ যায়নি। মোটকথা রূপ তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি কখনও। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের বর্ণনা তাঁর গল্পের অনেক অংশ জুড়েই ছিল। কিন্তু এত যে বিশাল রূপরাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তাতে অশ্লীলতার লেশমাত্র ছিল না। রূপলোককে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা দিতে কুণ্ঠাবোধ না করলেও কাম-লোককে বর্জন করেছেন সবসময়। যৌবনধর্মে উজ্জিবীত লেখক কামের আবরণ দ্বারা রূপকে কলুষিত না করে গতানুগতিকতাকে পরিহার করে এক স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মনোহর পরিবেশে প্রতিটি চরিত্রকে দেবীর সঙ্গে তুলনা করে আরও বেশী গাম্ভীর্য নিয়ে এসেছেন। তবে এক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল কোন ধর্মীয় আবেগে তাড়িত হয়ে নয়, বরং বলা যায়, কৃষ্ণনগরের মূর্তির অভিনব সৌন্দর্য তাঁর হৃদয়ে রোপিত ছিল। আর এসব সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বলেই হয়ত তিনি

Dhaka University Institutional Repository

অশ্লীলতাকে বর্জন করেছেন, কামকে এড়িয়ে গেছেন। আর এ কারণে যে সকল কবি লেখক অশ্লীলতাকে পরিহার করে কেবল সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁরা প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা আলোচনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন "বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, কামলোকের উপরে রূপলোক বলে আর একটি লোক আছে। যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে রূপলোকে তুলতে পারেন তিনিই যর্থাথ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপলোকের বস্তু, কামলোকের নয়, তা যাঁর অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যাঁদের তা নেই, অর্থাৎ যাঁরা অন্ধ, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।"[৪]

আর্ট সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন পূর্ণ মাত্রায় সচেতন। গুণের পরিচয় কেবল গুণীর পক্ষেই সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর রূপের অন্তরালে কবিগুরুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার সন্ধানও তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর বিশাল প্রতিভার জ্যোতি প্রমথ চৌধুরী তাঁর দিকে প্রথম দৃষ্টি দিয়েই বুঝেছিলেন। এরপর তাঁর জ্ঞানের পরিচয়, পারিবারিক আবহ, তাঁর লেখা কাব্য, গল্প সবই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সবকিছুর মধ্যেই তিনি আর্টের পরিচয় পেয়েছিলেন। চিত্রাঙ্গদা কাব্য আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-চেতনা, তাঁর আর্টের নিপুণ ব্যবহারের প্রশংসা করেছেন। "চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্ন মাত্র, মানবমনের একটি অনিন্দ্রসুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন। এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মনিপুরের রাজকন্যা নন, সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরানী, হৃদয়নাটকের রত্নপাত্রী। আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানবমনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে, নয় সুরে ও ছন্দে, নয় ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল ও শক্তি।"[৫]

প্রমথ চৌধুরীর সৌন্দর্যচেতনার পরিচয় তাঁর সকল কাজে সকল সময়ে ফুটে উঠেছে। "এই রূপচেতনার স্পষ্ট পরিচয় পাই 'সবুজ পত্র' প্রবন্ধে। মনে হয়, প্রমথ চৌধুরী- সবুজ রং যে প্রাণের রং, এ তত্ত্বটি বোঝাতে গিয়ে বর্ণভান্ডের সমস্ত রং উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। প্রকৃতিতে কত যে রং ফুটে উঠে প্রাণের স্পর্শে, তা চক্ষুষ্মান সজাগ লেখকের বর্ণালিম্পনে ধরা পড়েছে।"[৬] সবুজ রঙের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন "বেগুনি কিশলয়ের রং, জীবনের পূর্বরাগের রং;

Dhaka University Institutional Repository

লাল রক্তের রং, জীবনের পূর্ণরাগের রং; নীল আকাশের রং, অনন্তের রং; পীত শুস্ক পাত্রের রং, মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীনপত্রের রং, রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি। তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পূর্বসীমায় বেগুনি আর পশ্চিমসীমায় লাল। অন্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম। ... সবুজের মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। ঊষার গোলাপী, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীললোহিত বিরোধালংকারস্বরূপে সবুজ- পত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকদ্যুতি কখনো উজ্জ্বল, কখনো কোমল করে তুলবে।"[৭]

প্রমথ চৌধুরীর গল্পে ইন্দ্রিয়জ রূপের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর গল্পে বর্ণিত নারী-মূর্তি সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিমত "চার-ইয়ারি কথা ও অন্যান্য ছোট গল্পে নারী-রূপের যে বর্ণনা পাই, তাতে এই ধারণাটি সমর্থিত হয়। নারীরূপবর্ণনাতেও প্রমথীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান। বাংলা উপন্যাসের বাঁধাধরা বর্ণনা বর্জন করে তিনি নাম নয়, রূপের উপরই জোর দিয়েছেন। রূপলোকের real-কে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ফলে তার সৃষ্ট নারীচরিত্র-গুলি দেশকালের গন্ডীতে ধরা দেয় না। তাদের বর্ণনায় যে প্রত্যক্ষতা, ঋজুতা, ভাস্করসুলভ স্পষ্টতা, গ্রীসীয়সুলভ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ও detail রঙের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তা চিরাচরিত নয়। অথচ এই বর্ণনা কোথাও সম্ভোগে আবিল নয়, তা রূপধ্যানে ভাস্কর । অতি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বর্ণনা যে স্থূল বস্তুসর্বস্বতা ও পঙ্কিল যৌনলালসায় পরিণত হয়নি, তার মূলে আছে প্রমথ চৌধুরীর অসাধারণ শিল্পসংযম। এই সবক'টি গুণেরই পরিচয় তাঁর গল্পে ছড়িয়ে আছে। তাঁর রমণীমূর্তিরা গ্রীকসৌন্দর্যজগতের অধিবাসিনী।"[৮]

প্রমথ চৌধুরীর গল্পে বর্ণিত নারী চরিত্রগুলির রূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গ্রীক নারীদের সৌন্দর্য তাঁকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে। এই রূপ বর্ণনায় তিনি কখনই কাম দ্বারা তাড়িত হননি। তাতে কেবল সুন্দরের চমৎকার অভিব্যঞ্জনায় নতুন মাত্রা পেয়েছে। প্রবল রূপতৃষ্ণা তাঁর অন্তরে সুপ্ত ছিল বলে, রূপের আকর্ষণ তাঁকে মুগ্ধ করত বলেই তিনি এত সুন্দরভাবে রূপের বর্ণনা করতে পেরেছেন। ভাস্করসুলভ শিল্পমন তাঁর মধ্যে সবসময় জাগ্রত ছিল। তিনি যেন একজন শিল্পীর তুলির

Dhaka University Institutional Repository

আঁচড়ে নারীর রূপকে আর সংহত, আরো উজ্জ্বল আর সুন্দর, আর মনোহর করে তুলেছেন। তিনি নারীরূপ বর্ণনায় এক চমৎকার ভঙ্গিমা উপস্থাপন করেছিলেন তার কিছু নমুনা নিচে দেয়া হল-

"আমার মনে হল সে আপাদমস্তক বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তার চোখের কোণ থেকে তার আঙুলের ডগা দিয়ে অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ ঠিকরে বেরুচ্ছিল। Leyden jar এর সঙ্গে স্ত্রীলোকের তুলনা দেওয়াটা যদি সাহিত্যে চলত তা হলে ঐ এক কথাতেই আমি সব বুঝিয়ে দিতুম। সাদা কথায় বলতে গেলে প্রাণের চেহারা তার চোখ-মুখ, তার অঙ্গ-ভঙ্গি, তার বেশ-ভূষা, সকলের ভিতর দিয়ে অবাধে ফুটে বেরোচ্ছিল। সেই একদিনের জন্য আমি বিশ্বাস করেছিলুম যে অধ্যাপক জে. সি. বোসের কথা সত্য-প্রাণ আর বিদ্যুৎ এক পদার্থ।"[৯] (ছোটো গল্প)

"আরও কাছে এসে দেখি, বেঞ্চিতে যে বসে আছে সে একটি ইংরেজ রমণী-পূর্ণযৌবনা-অপূর্ব সুন্দরী ! এমন রূপ মানুষের হয় না- সে যেন মূর্তিমতী পূর্ণিমা! আমি তার সমুখে থমকে দাঁড়িয়ে, নির্মিমেষে তার দিকে চেয়ে রইলুম। দেখি সেও একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। যখন তার চোখের উপর আমার চোখ পড়ল তখন দেখি তার চোখদুটি আলোয় জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে; মানুষের চোখে এমন জ্যোতি আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি। সে আলো তারার নয়, চন্দ্রের নয়, সূর্যের নয়- বিদ্যুতের। সে আলো জ্যোৎস্নাকে আরো উজ্জ্বল করে তুললে, চন্দ্রালোকের বুকের ভিতর যেন তাড়িত সঞ্চারিত হল।"[১০] (চার-ইয়ারি কথা)

প্রমথ চৌধুরীর গল্পে বর্ণিত এসব নারীচরিত্র চিত্রণে মূর্তি, বিদ্যুৎ প্রতিকল্পই বার বার ফিরে এসেছে। আর এসব রমণীরা পূর্ণযৌবনা হলেও সৌন্দর্যের অজস্র উপমা ব্যবহৃত হলেও কোথাও অশ্লীলতা নেই। এ দেশীয় রমণীদের রূপ বর্ণনায় তিনি যেমন কার্পণ্য করেননি, তেমনি বিদেশী রমণীদের সৌন্দর্য ও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

"এই অবসরে আমি যুবতীটিকে একবার ভালো করে দেখে নিলুম। তাঁর মতো বড়ো চোখ ইউরোপে লাখে একটি স্ত্রীলোকের মুখে দেখা যায় না- সে চোখ যেমন বড়ো, তেমনি জলো, যেমন নিশ্চল, তেমনি নিস্তেজ। এ চোখ দেখলে সীতেশ ভালোবাসায় পড়ে যেত, আর সেন কবিতা লিখতে বসত। তোমাদের ভাষায় এ নয়ন বিশাল, তরল, করুন, প্রশান্ত।"[১১] (চার-ইয়ারি কথা)

"খুলেই দেখি, একটি স্ত্রীলোক । চমৎকার দেখতে, একেবারে নীল পাথরের ভেনাস।"[১২] (ভূতের গল্প)

নারীরূপের চমৎকার বর্ণনা দেখে মনে হয় কোন শিল্পীর তুলির আঁচড়ে আঁকা কোন মূর্তি যা এত জীবন্ত যে তখনই কথা বলে উঠবে। আর সেটা ছিল এক প্রেতাত্মার বর্ণনা। বাইজির রূপ বর্ণনাতেও তিনি একইরূপ সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

"এ সরস্বতী পাথরে কোঁদা নয়, রক্তমাংসে গড়া। আমার মনে হল এ রমণী বাঙালী। কেননা তাঁর মুখেচোখে 'নিমক' ছিল ; সংস্কৃত যাকে বলে লাবণ্য। কোনো বৈষ্ণব কবি এঁর সাক্ষাৎ পেলে বলতেন, 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গে লাবণী অবনী বহিয়া যায়', যে কথা কোনো হিন্দুস্থানী সুন্দরীর সম্বন্ধে বলা যায় না।"[১৩] (বীণাবাই)

"সেই গ্রীসিয়ান নাক, সেই ভায়োলেট চোখ। আর সেই ঠোঁট-চাপা হাসি, যার ভিতরে আছে শুধু জাদু।"[১৪] (মেরি ক্রিসমাস)

প্রমথ চৌধুরী যে যর্থাথই রূপের ভক্ত ছিলেন তা তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়। তাঁর সৃষ্ট নারী-পুরুষ উভয় চরিত্রেই সৌন্দর্যের বর্ণনা এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এ প্রসঙ্গে 'বীরপুরুষের লাঞ্ছনা' গল্পে তিনি বলেছেন- "আমি চিরকালই রূপ ও শক্তির বিশেষ ভক্ত। কাজেই আমি দুদিনেই তাঁর একটি ভক্ত বন্ধু হয়ে উঠলুম।"[১৫] যে কারণে পুরুষ চরিত্রও তাঁকে সমান আকৃষ্ট করত এবং পুরুষচরিত্রের সৌন্দর্যও অনুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁর গল্পে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

"অত বলিষ্ঠ অত সুপুরুষ যুবক আমাদের মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না। ... তাঁর শরীর ছিল যেমন সুঠাম তেমনি বলিষ্ঠ, আর তাঁর মুখটি ছিল কুঁদে কাটা। টেনিস খেলতে, ঘোড়ার চড়তে, দাঁড় টানতে তাঁর জুড়ি বিলাতপ্রবাসী ভারতবাসীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত না। তিনি বাঙালী হলেও, কোনো পাঞ্জাবী কি কাশ্মীরি যুবক রূপে-বলে তাঁর সমকক্ষ ছিল না। যাঁরা তাঁর চাইতে বলিষ্ঠ ছিলেন তাঁরা কদাকার, আর যাঁরা তাঁর চাইতে সুন্দর ছিলেন তাঁরা নেহাত মেয়েলি। একমাত্র তাঁর শরীরেই বল ও রূপের রাসায়নিক যোগ হয়েছিল।"[১৬] (বীরপুরুষের লাঞ্ছনা)

"প্রথমেই নজরে পড়ল, তিনি একটি মহাপুরুষ না হলেও একটি প্রকান্ড পুরুষ। তাঁর তুলানায় কর্নেল- সাহেবটি ছিলেন ছোকরা মাত্র। স্বামীজি যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। চোখের আন্দাজে বুঝলুম যে তাঁর বেড় অনন্ত আটচল্লিশ ইঞ্চি হবে। অথচ তিনি স্থূল নন। এ শরীর যে কুস্তিগীর পালোয়ানের সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ রইল না। কুস্তিগীর হলেও তাঁর চেহারাতে চোয়াড়ে ভাব ছিল না। তাঁর বর্ণ ছিল গৌর, অর্থাৎ তামাতে রূপোর খাদ দিলে এই উভয় ধাতু মিলে যে রঙের সৃষ্টি করে, সেই গোছের রঙ। তাঁর চোখের তারা দুটি ছিল ফিরোজার মতো নীল ও নিরেট। এরকম নিষ্ঠুর চোখ আমি মানুষের মুখে ইতিপূর্বে দেখি নি।"[১৭] (সহযাত্রী)

"আর তার রূপ! অমন সু-পুরুষ আমি জীবনে কখনো দেখি নি। সে ছিল কালোপাথরের জীবন্ত এপোলো। সে যখন প্রথমে এল, পরনে হলুদে- ছোপানো ধুতি, মাথায় একই রঙের পাগড়ি, তার নীচে একমাথা কালো কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ঠোঁটে হাসি ও বগলে লাল টুকটুকে একখানি হাতআড়াই বাঁশের লক্‌ড়ি, তখন বাড়ীসুদ্ধ লোক তার রূপ দেখে চমকে উঠলেন। মা আস্তে বললেন, 'স্বয়ং শ্রী-কৃষ্ণ।"[১৮] (ঝাঁপান খেলা)

রূপের সাথে জ্ঞানকে, শক্তিকেও প্রমথ চৌধুরী একত্র করেছিলেন। বিশেষ করে পুরুষ-চরিত্রের রূপ অঙ্কনে এ দিকটা বেশী চোখে পড়ে।

"তিনি ছিলেন সুপুরুষ, অতি বলিষ্ঠ, অতি ভদ্র আর অতি বুদ্ধিমান ; উপরন্তু তিনি ছিলেন অতি ধনি এবং অতি অমিত ব্যয়ী।"[১৯] (এ্যাডভেঞ্চার জলে)

Dhaka University Institutional Repository

"তরুণের মুখে নাক-চোখ অবশ্য মাপজোকের হিসেবে নৃপেনের চাইতে ঢের বেশী Correct ছিল; কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি যে, নৃপেনের রূপের ভিতর এসবের অতিরিক্ত কি একটা পদার্থ ছিল, যা মানুষের মনকে আকর্ষণ করে।"[২০] (ট্রাজেডির সূত্রপাত)

প্রমথ চৌধুরী নারীচরিত্রের রূপ বর্ণনায় যেমন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তেমনি তাঁর অসমান্য প্রতিভার স্বাক্ষরে প্রকৃতিরও অপরূপ রূপে সেজেছে তাঁর বিভিন্ন গল্পে। প্রকৃতির যে চিত্র তিনি এঁকেছেন, তাতেও তাঁর ভাস্করসুলভ শিল্পী মনের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। আর প্রকৃতির চিত্র অঙ্কনেও তিনি কোন চিরাচরিত প্রথাকে অনুসরণ করেননি।

"মাথার উপরে সোনার আকাশ, পায়ের নীচে সবুজ মখমলের গালিচা, চোখের সমুখে হীরেকষের সমুদ্র, আর ডাইনে বাঁয়ে শুদু ফুলের- জহরৎ- খচিত গাছপালা- সে পুষ্পরত্নের কোনোটি- বা সাদা, কোনোটি- বা লাল, কোনোটি- বা গোলাপি, কোনোটি- বা বেগুনি।"[২১] (চার-ইয়ারি কথা)

রূপকে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের আলো বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই সাহিত্যের মধ্যে আলো আনতে হলে রূপকে প্রাধান্য দিতেই হয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের অভিমত "দেহের নবদ্বার বন্ধ করে দিলে মনের ঘর আলোকিত কিংবা পারলৌকিক অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে উঠবে- বলা কঠিন।"[২২] আর এই আলোর সন্ধান করতে গিয়ে তিনি জ্ঞানকেও প্রধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি রূপের মোহে মত্ত হয়ে কেবল রূপের নেশায় ঘুরে বেড়াননি, রূপের সাথে জ্ঞানকে সংশ্লিষ্ট করে রচনাকে করেছেন ঋদ্ধ, মননশীল এবং ব্যতিক্রম। যে রূপ ভোগের আহ্বান জানায় সে রূপের পথে তিনি অগ্রসর হননি। বরং এমন নিখুঁত বর্ণনা আর শিল্পসৌন্দর্য সংযোজিত হয়েছে যে তা সবসময় নগ্নতা ও স্থূলতাকে বর্জন করেছে। তাঁর গল্পে বর্ণিত নারীচরিত্রের রূপের মনোহর বর্ণনা পাঠকের মনকে আলোড়িত করে, ভোগের আকাঙ্খা জাগায় না। এর সাথে ভোগের লোভের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর রূপ বর্ণনা কোথাও শরীরী হয়ে উঠেনি। "সামগ্রিকভাবে বিচার করলে তাকে রূপমুগ্ধ সষ্টা বলে মনে হয় না। এর কারণ বোধ হয় তাঁর অতন্দ্র বুদ্ধিধর্ম। প্রমথ চৌধুরীর প্রখর মননবৃত্তি সজাগ প্রহরীর মতো তাঁর গভীর রূপদৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং প্রহরীটি এত বেশী

Dhaka University Institutional Repository

সজাগ ছিলো যে, রূপাবেশ কবির চোখে বাইরের দেউড়ি পার হয়ে তাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারে নি। প্রমথ চৌধুরী প্রখর ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে রূপমুগ্ধ স্রষ্টা হতে পারেন নি, রূপের প্রতি অসামান্য আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও রূপ যে তার চোখে ও মনে রং ধরায় নি- তার কারণ হিসেবে বুদ্ধিবাদকে নির্দেশ করা ছাড়া গতান্তর নেই। তবে রূপ নিঃসন্দেহে তার জীবনদর্শনের দর্শনীয় কারুকার্য (embroidery) হয়ে উঠেছে।"[২৩] আর প্রমথ চৌধুরী যে রূপের বর্ণনা করেছেন তা প্রাণহীন জড়রূপ নয়। তিনি রূপের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে যেমন প্রাণের বিকাশ ঘটিয়েছেন তেমনি তার সাথে বুদ্ধির সম্মিলন ঘটিয়ে ভোগলিপ্সার গন্ডির বাইরে এক দেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে এসেছেন।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর গল্পের নায়িকার রূপ বর্ণনায় চমৎকার সব উপমা ব্যবহার করে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু দেহসর্বস্ব বর্ণনা করে ভোগ বিলাসকে প্রাধান্য দেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন "দেহকে অতটা প্রাধান্য দিলে মন পদার্থটি বিগড়ে যায়; তার ফলে দেহ মন পৃথক হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্তে জ্ঞাতিশত্রুতা জন্মায়।"[২৪] একই সাথে বলেছের "ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনেরি ধর্ম।"[২৫] জ্ঞানের পথিক প্রমথ চৌধুরী কৃষ্ণনগরে কুমোরদের দেখেছেন তারা মূর্তি গড়তে বাঁদর গড়ত না, তাদের হাতের সেই নিখুঁত কাজ তাঁর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল এখান থেকেই তিনি রূপের প্রতি এত বেশী ভক্ত হয়েছিলেন। রূপের সাথে তিনি ভোগকে, অশ্লীলতাকে না জড়িয়ে তার সঙ্গে বরং জ্ঞানের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি ব্যঙ্গাত্মক একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছেন। অন্যসব বিষয়ের মতো রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রেও একটা উদাসীনতা ও হৃদয়াবেগবর্জিত চিন্তা ভাবনা কাজ করেছে। জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের মতে- "যে ব্যঙ্গ প্রধান উদ্ভট মনোবৃত্তি (প্রত্যেকটি চরিত্রের বিবরণ বা বিশেষণী বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের পরিচায়ক) নিয়ে তিনি চরিত্রগুলি, বিশেষ করে রূপসীদের ছবি এঁকেছেন, তাতে মনে হয়, রূপমোহের আবেশ তাঁর নিজের চোখেই কোনোদিন গভীরভাবে ঘনায় নি, পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা দূরের কথা। আসল কথা, প্রমথ চৌধুরীর রূপবাদ অতীন্দ্রিয় আদর্শবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; তাঁর রূপদৃষ্টি প্রেরণা নয়। তাঁর গল্পে মননের ঔজ্জ্বল্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।"[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বীরবল ও বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যালোক, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ১৩৪।

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৫।

৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৬।

৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৮।

৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৮।

৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৯।

৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৯।

৮। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪০।

৯। প্রমথ চৌধুরী বিশ্বভারতীয় গ্রন্থ বিভাগ, ১ম সংস্করণ, ১৩৪৮, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃঃ ১৬৫।

১০। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪।

১১। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫।

১২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৩।

১৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮১।

১৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০২।

১৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৫।

১৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৫।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৬।

১৮। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৮।

১৯। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৭।

২০। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৩।

২১। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

২২। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রমথ চৌধুরী, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৪, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ৬৩।

২৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬।

২৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১।

২৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২।

২৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

প্রমথ চৌধুরীর গল্পে বুদ্ধির তীক্ষ্ণ প্রয়োগ, ব্যঙ্গাত্মক মনোভঙ্গি, পরিহাসনৈপুণ্য, যুক্তি-প্রবণতা, সৌন্দর্যচেতনা, যৌবনধর্ম এবং সর্বোপরি মৌলিক সুরটি বার বার ফিরে এসেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত, প্রচুর অভিজ্ঞতার অধিকারী লেখক গল্পের অন্যতম বিষয় করেছেন বুদ্ধিবৃত্তিকে। তাই তাঁর গল্পের আলোচনা শেষে বলা যায় বিষয়, চরিত্র, ভাষা, আঙ্গিক সবক্ষেত্রেই তিনি তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। 'সবুজ পত্র' পত্রিকা সেই সময়কার সাহিত্য জগতে এক বিপুল পরিবর্তন এনেছিল, আবেগ, উচ্ছ্বাসকে প্রাধান্য না দিয়ে যুক্তিবাদ, তর্ক-বিতর্ক এবং সংযম ও বুদ্ধির চর্চা করেছিল। আনন্দ সৌন্দর্যকে প্রধান অঙ্গ করে নিয়ে হাস্য-পরিহাস আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছিল এই গোষ্ঠীর লেখার বিষয়। প্রমথ চৌধুরী ঠিক ঐ বিষয়গুলোকে তাঁর লেখায় প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর গল্পগুলি আলোচনায় দেখা গেছে তিনি হাসির চর্চা করেছেন। পরিহাস-প্রবণ এবং যুক্তিপ্রিয় এই লেখকের যে বিষয়টি সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে তাহল যৌবনের জয়গান, তিনি সব সময় মানসিক যৌবন চর্চার কথা বলেছেন। গল্পের বিষয়ে সহজেই প্রতীয়মান যে প্রতিটি গল্পে সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে যৌবনধর্ম তার স্বমহিমার উপস্থিত। বাঙালীর অলস মনকে তিনি নিদ্রাভঙ্গ করে জাগিয়ে তুলেছেন, যৌবনধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন। মানসিক যৌবনের অধিকারী লেখক যৌবনের জয়গান করতে গিয়ে কোন কান্না, কোন দুঃখ বেদনাকে প্রাধান্য না দিয়ে সৌন্দর্যধ্যানে গল্পের ভিতর হাস্য-পরিহাস এনে গতানুগতিকতাকে পরিহার করেছেন।

কৌতুক সৃষ্টি এই যৌবনের পূজারী লেখকের এক বিশেষ দিক, যে কোন প্রসঙ্গেই তিনি কৌতুক নিয়ে এসেছেন, ব্যঙ্গ করেছেন, রসিকতাচ্ছলে সত্যভাষণ দ্বারা সমাজকে সত্য কথা শিখিয়েছেন, আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। অভিজ্ঞ এই লেখক গল্পের মাধ্যমে সমাজের লোকদের উপদেশে জর্জরিত না করে, বেদনাভারে গল্পগুলোকে ভারাক্রান্ত না করে হাসির মাধ্যমে জীবনের সত্য রূপটিকে তুলে এনেছেন। গল্পগুলি আলোচনায় একটি বিষয় বার বার দেখা গেছে তাহল একটি গভীর বিষয় নিয়ে গল্প শুরু হলেও তাকে ব্যঙ্গ করে গভীরতার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে নতুন কোন

Dhaka University Institutional Repository

চমকে পাঠককে হাসাতে চেয়েছেন। কিন্তু বাঙালী চিরকাল কাঁদতে ভালোবাসে, তাই প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধির মারপ্যাঁচ, কথার যাদুকরী ছন্দ, আর যৌবনের আনন্দঘন আড্ডা অনেক পাঠকের চোখ এড়িয়ে গেছে, তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করতে পারেননি। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী যে নীতি ও আদর্শ নিয়ে সাহিত্য জগতে আবির্ভুত হয়েছিলেন তা থেকে তিনি বিচ্যুত হননি এতটুকু। আবেগের জোয়ারে গা না ভাসিয়ে মননশীল জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে বুদ্ধি আর যৌবনের জয়গানে তাঁর সাহিত্য জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর গল্পগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে তা সহজেই বোঝা যায়। প্রতিটি গল্পেই তাঁর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে সমাজের বিচিত্র চরিত্র, বিচিত্র বিষয় তাঁর গল্পের বাহন হলেও একটি অভিন্ন মিল সবক্ষেত্রেই ছিল তাহল বুদ্ধি, ব্যঙ্গ, সৌন্দর্য আর কথার মারপ্যাঁচ প্রতিটি গল্পের অন্যতম বিষয়।

প্রমথ চৌধুরীর চলিত রীতিকে লেখার প্রধান বাহন করলেও শব্দ ব্যবহারে একটা ধ্রুপদী ভঙ্গি আনার ফলে ভাষায় একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। ভাবালুতার চিরশত্রু, তীক্ষ্ণচমকে, ব্যঙ্গরসের সমাহারে ভাব ভাষা ছন্দে যে মৌলিকতার বীজ বপন করেছেন তার সাথে তুলনা করার মত লেখকের সংখ্যা কম ছিল। তিনি ছিলেন রূপবাদী লেখক, তাঁর রূপচেতনা বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে রূপভাবনায় বিষয় ও আঙ্গিকের মত তাঁর ভিন্ন চিন্তা ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। সারাজীবন তিনি সৌন্দর্যের সাধনা করেছেন, মনে হয় সৌন্দর্য প্রকাশই সাহিত্যের মূখ্য উদ্দেশ্য করে নিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন অতন্ত্র নিষ্ঠা ও সাধনা । প্রমথ চৌধুরীর অনুশীলিত মনের সার্থক প্রতিফল তাঁর রচনায়। তাঁর গল্পের মূল সুরে রয়েছে জীবনীশক্তির এক অনিবার্য প্রকাশ। ভাবালুতা আবেগকে যিনি প্রশ্রয় দেননি, যিনি যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু বিচার করতেন সেই প্রমথ চৌধুরীর ইন্দ্রিয়টি ছিল অতি প্রখর। রূপ কখনও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর গল্পের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় প্রেমের গল্পে যেমন রূপের বর্ণনা রয়েছে তেমনি ভূত-পেত্নী, পাগল, জমিদার, দাসী, প্রবঞ্চক, চোর, লাঠিয়াল, বাইজি সব চরিত্রই এক অপরূপ সৌন্দর্যের অকৃত্রিম আঁধার। সৌন্দর্যের সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট করেছেন বুদ্ধিমত্তাকে। উদারভাবে তিনি রূপের জয়গান করেছেন। কৃষ্ণনগরের কুমোরদের দেখেছেন তারা কখনও মূর্তি গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ত না এখান থেকেই তিনি রূপের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি ভক্ত হয়েছেন। জ্ঞানের সাধনায় নিবেদিত প্রাণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারী লেখক তাঁর সাহিত্য সাধনায় সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন খুব বেশী। রূপ কখনও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। জ্ঞানের অন্বেষণের সাথে তিনি রূপ বিষয়টিকেও তাঁর লেখায় সমান মর্যাদা দিয়েছেন এজন্য যে তিনি হয়তো মনে করতেন জ্ঞানের সাথে রূপের সংযোগেই কেবল সমৃদ্ধ আনন্দদায়ক সাহিত্য রচনা করা সম্ভব, তা না হলে সাহিত্য হয়ে যাবে একঘেঁয়ে ও বিস্বাদ। তিনি রূপের চমৎকার বর্ণনায় এমন সব উপমা ব্যবহার করেছেন যা তাঁর গল্পের আঙ্গিককে করেছে অভিনব ও স্বতন্ত্র।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন সার্থক ভাষাশিল্পী, গদ্য ভাষায় তিনি শিল্পরূপের চর্চা করেছেন এবং সার্থক হয়েছেন। অভিনব সব চরিত্র এনেছেন, যাদের চরিত্র রয়েছে নানা অসঙ্গতি। যদিও এসব চরিত্রের প্রতি কোথাও কোন দুর্বলতা বা সহানুভূতি তিনি দেখিয়েছেন, সংযত প্রয়োগে তা হয়েছে প্রচ্ছন্ন। মানুষকে রহস্যময় চরিত্র হিসেবে তিনি রূপায়িত করেছেন। মানুষের প্রতি প্রমথ চৌধুরীর যে ভালোবাসা ও মমত্ববোধ ছিল তা তিনি অলক্ষ্যে রাখতে পছন্দ করতেন। তাই তাঁর গল্পে দেখা গেছে কোন চরিত্রের প্রতি সামান্য হৃদয়াবেগ প্রকাশিত হলেও তার প্রকাশ হয়েছে সংযত ও প্রচ্ছন্ন। কিংবা বলা যায় কোন বিষয়কে গভীর দুঃখ বেদনার বাষ্পে ভারাক্রান্ত না করে সেখানে কৌতুকচ্ছলে গভীর বিষয়কে হালকা করে বাঙালীকে কান্নার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। তিনি যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে কাহিনী রচনা করেছেন, কথার যাদুকরী ছন্দে যে চমৎকার আঙ্গিক গড়ে তুলতেন তাকে যদি ব্যঙ্গ বিদ্রূপে হালকা করে না তুলতেন তা হলে হয়তো পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিতে পারতেন।

প্রমথ চৌধুরীর গল্প পর্যালোচনা করে একটি অভিনব বিষয় লক্ষ্য করা গেছে তাহল মজলিসী আবহ সংযোগের মাধ্যমে ভিন্নধারার আঙ্গিক উপস্থাপন । তিনি গল্পে মজলিসী আসর বসিয়েছেন। এসব মজলিসে থাকতেন বিভিন্ন শ্রোতা আর গল্পবলিয়ে ঘোষাল কিংবা নীল-লোহিত। নীল-লোহিত ও ঘোষালকে ঘিরে যে শ্রোতৃবৃন্দ তাঁরা সকলে তর্কপ্রিয়, যুক্তি বুদ্ধি আর কথার মারপ্যাঁচে তাঁরা নীল-লোহিত ও ঘোষালকে শায়েস্তা করতে চেয়েছেন, কিন্তু এঁদের বুদ্ধির খেলায়, চমৎকার উপস্থিত বুদ্ধি ও কথার চাতুরীতে কোনভাবেই পরাস্ত করতে পারেননি। এসব মজলিসী

Dhaka University Institutional Repository

গল্পে কোন আদিরস বা অমার্জিত বিষয় দ্বারা গড়ে উঠেনি। বরং তা যুক্তি বুদ্ধি আর টান টান উত্তেজনায় এগিয়ে গেছে। বুদ্ধি, বাকচাতুর্য, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর কথার ফুলঝুড়িতে এসব গল্পের আঙ্গিকগত নৈপুণ্য চমৎকার ব্যঞ্জনার প্রতিভাত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর সাহিত্য সাধনার মূল বিষয় ছিল যৌবনের, তারুণ্যের, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের বন্দনা, প্রগতি ভাবনা মননশীল চিন্তা, সংস্কারলেশহীন মনোভাবের চর্চা, ভাবাবেগমুক্ত নির্মোহ বুদ্ধির জয়গানের মাধ্যমে গল্পের স্বতন্ত্র আঙ্গিক গঠন। প্রচুর পড়েছেন, বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন দেখে শুনে বুঝে তাঁর ঋদ্ধ মনের দ্বার খুলেছেন, বুদ্ধির চর্চা করেছেন, ব্যঙ্গের কষাঘাত দ্বারা ঘুমন্ত সমাজকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত লেখকের চিত্ত ছিল সদানন্দে পূর্ণ, চেতনামুখী লেখক উজ্জ্বল জ্ঞানঐশ্বর্য্যে নিজের চিত্তকে পূর্ণ করে সত্যের ভাষণে ব্যঙ্গ স্ফূলিঙ্গে সমস্ত গল্পের অবয়বে দীপ্তি ছড়িয়েছেন।

গল্পের ঘটনা বিন্যাসের চেয়ে মন্তব্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, রসের নির্মোহ আবরণে গা না ভাসিয়ে তাকে বুদ্ধির চমকে উদ্ভাসিত করেছেন। কাহিনীর ক্ষেত্রে সবসময় একই মনোভঙ্গি কাজ করেছে প্রচলিত ঢঙে কাহিনীর জাল না বুনে তাকে আবেগের মোড়কে না জড়িয়ে কাহিনীর মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর জীবন সমালোচনা উপস্থিত করেছেন।

বিষয় বৈচিত্র্য সৌন্দর্যচেতনা ও ভিন্ন প্রকার আঙ্গিক পরিকল্পনায় প্রমথ চৌধুরী যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁকে খুব সহজেই সমকালীন লেখকগোষ্ঠী থেকে আলাদা করা যায়। তাঁর গল্পের বিষয় ও আঙ্গিক পর্যালোচনা করে যে বিষয়গুলি পাওয়া গেছে তা হল যৌবনচেতনা, সৌন্দর্য-চেতনা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, হাস্য-পরিহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, গভীর বিষয়কে হালকা চালে বলে যাওয়া এবং একটি মহৎ চরিত্রকে বাঁদর চরিত্র করে তুলার প্রবণতা। এছাড়াও তিনি বাস্তব জীবনের দুঃখ বেদনাকে অত বেশী প্রাধান্য না দিয়ে গতানুগতিকতাকে পরিহার করে কল্পনার জাল বিস্তার করে সত্য মিথ্যার কাহিনী বানিয়ে পাঠককে নির্মল আনন্দ দিতে চেয়েছেন। আর একারণে তিনি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মনের মনি কোঠায় চিরস্মরণীয় আসন করে নিতে না পারলেও তাঁর যুক্তি বুদ্ধি মেধা আর রুচিশীল সাহিত্য সৃষ্টির কারণে সচেতন পাঠক সমাজে সাহিত্যের চিরস্থায়ী আসন করে নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে এবং ছোটগল্পের অবয়ব নির্মাণে সম্পূর্ণ এক নতুন ধারা প্রবর্তন করে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমান অভিসন্দর্ভে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যর আলোকে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র নির্মাণ ও রস সৃষ্টির দিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আলোক রায়	ঃ	কথা সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সাহিত্যলোক, ১৯৯২।
ডঃ শিখা ঘোষ	ঃ	মানিক বন্দোপাধ্যায়ঃ ছোটগল্প, অবয়বগত বিশ্লেষণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৯০।
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ঃ	সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪০৫।
শিশিরকুমার দাশ	ঃ	বাংলা ছোটগল্প, দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৫।
মাহবুবুল আলম	ঃ	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৯৪।
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	ঃ	কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের একশ' বছর (১৮৯১-১৯৯০) দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯০।
শ্রীভূদেব চৌধুরী	ঃ	বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৯৯।
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	ঃ	বীরবল ও বাংলাসাহিত্য, সাহিত্যেলোক, কলকাতা, ১৯৮৮।
ক্ষেত্রগুপ্ত	ঃ	বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ১৯৯৮।
প্রমথনাথ বিশী	ঃ	বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার, মিত্র ও ঘোষ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৭১।
বিনয় ঘোষ	ঃ	বাংলায় বিদ্বৎ সমাজ, প্রকাশ ভবন, ১৯৮৭।
রামগতি ন্যায়রত্ন	ঃ	বাঙগালা ভাষা ও বাঙগালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯১।
অশোককুমার সরকার	ঃ	সবুজ পত্র ও বাংলা সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪।
শশিভূষণ দাশ গুপ্ত	ঃ	বাংলা গদ্যের একদিক, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৯৩।
প্রমথনাথ বিশী	ঃ	বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭২।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঃ	বাংলা ভাষা পরিচয়, বিশ্বভারতী, ১৩৭৫।
ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	ঃ	বাঙগালা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাঙলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, পরিবর্তিত সংস্করণ ১৯৬৮।
প্রমথ চৌধুরী	ঃ	গল্প সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯৪।
প্রমথ চৌধুরী	ঃ	প্রবন্ধ সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৯৩।
প্রমথ চৌধুরী	ঃ	সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৩৮৭।
অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়	ঃ	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৫ম খন্ড), মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৫।
শ্রীসুকুমার সেন	ঃ	বাঙগালা সাহিত্যে গদ্য, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৩।
রথীন্দ্রনাথ রায়	ঃ	বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী, জিজ্ঞাসা, ২য় মুদ্রণ, ১৯৬৯।
বারিদবরণ ঘোষ	ঃ	সবুজ পত্রঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, বর্ণালী, কলকাতা, ১৯৯৯।
বীরেন্দ্র দত্ত	ঃ	বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, দেজ অফসেট, ১৯৯৫।
মনোজ মুখোপাধ্যায়	ঃ	বাংলা ছোটগল্প উৎস ও স্বরূপ, উষা পাবলিশিং, ২০০০।
রথীন্দ্রনাথ রায়	ঃ	ছোটগল্পের কথা, পুস্তক বিপণি,কলিকাতা, ১৯৯৬।